রূপালি পাখি

বুদ্ধদেব বসু

ডি, এম্, লাইব্রেরি
৬১, কর্ন্ওয়ালিস স্ট্রিট
কলিকাতা

প্রকাশক—
শ্রীগোপালদাস মজুমদার
ডি. এম. লাইব্রেরি
৬১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রিট, কলিকাতা।

প্রথম সংস্করণ
মে, ১৯৩৪

মূল্য ১৲

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস,
প্রিণ্টার—শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়
৭১।১নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রিট, কলিকাতা।

উৎসর্গ

শ্রী পঙ্কজকুমার দাশগুপ্ত

বসন্তের সেই সকালবেলায় সে ঘুম থেকে উঠলো: আর উঠে দেখলো সে একা ; নিজেকে তার একা লাগছে।

এখন, চিরকাল এই নিঃসঙ্গতাকে সে ভয় করেছে। একটা ভীষণ আতঙ্ক: যদি কখনো তাকে সত্যি-সত্যি একা থাকতে হয়। আর আমাদের জীবনটা এমনি যে সব সময় হাতের কাছে মানুষ পাওয়া যায় না ; আর মানুষ যদি বা পাওয়া যায়, ঠিক মানুষকে পাওয়া যায় না; আর এমনও যদি হয় যে ঠিক মানুষকেই পাওয়া গেলো, ঠিক সময় হয়-তো তখন নয়।

তবু, মানুষ নিয়েই আমরা বাঁচি। মানুষকে আমরা খুঁজি: মানুষকে ঘৃণা করি, মানুষকে ভালোবাসি। আর যদিও ঘৃণা জীবনের অবিচ্ছেদ্য একটা অংশ, পূর্ণতার একটা অঙ্গ, এমন কি—তবু, ভালোবাসতে পারলেই ভালো।

আর তাই সে তার যৌবনের প্রথম থেকে নিজের চারদিকে টেনে এনেছিলো ছোট একটি বন্ধুর দল। তাদের সে টেনে নিয়েছিলো নিজের মধ্যে, সেই বন্ধুদের, এডিসনের বাতি যেমন বিদ্যুতের স্রোতকে টেনে নেয় নিজের মধ্যে, তারপর জ্বলে' ওঠে। সে-ও জ্বলে' উঠেছিলো ; বন্ধুদের প্রাণের শিখা নিয়েছিলো শোষণ করে', বড় হ'য়ে উঠেছিলো নিজে। কেবল

সঙ্গ-লিপ্সা, কেবল সময় কাটানোর তাগিদ—তার চেয়ে অনেক বেশি এই বন্ধুতা। তার চেয়ে অনেক নিগূঢ়, অনেক জটিল—সত্তার অন্ধকার মূলে তার সঞ্চার। সেই আগুনে, সেই উত্তাপে তার জীবনের লালন। বন্ধুদের থেকে সে নিতো অকৃপণ, অপরিমিত স্রোতে—প্রায় নির্লজ্জভাবে। আর অবিশ্যি নিজেকে তার দিতেও হতো: কিছু না-ভেবে, কিছু বাকি না-রেখে।

ঠিক বলা হ'লো কী? কিন্তু যেটুকু সে বাকি রেখেছিলো, কোনো মানুষ তা অন্য-একজনকে দিতে পারে না। সে ভয় করতো—তার সত্তার সেই চেতনা-অতীত অন্ধকার, তাকেই সে ভয় করতো। কেননা সেখানেই নির্জ্জনতা: আমাদের চরম নিঃসঙ্গতা সেখানেই। সে তা ভুলে' থাকতে চাইতো; এমন ভাণ করতো যেন তা নেই। অনেক, অনেকদিন পর্য্যন্ত।

কিন্তু সেই অন্ধকারের দরজা কি খুলে গেলো আজ এই বসন্তের সকালবেলায়? কী আতঙ্ক! কী যন্ত্রণা!

মানুষ না-হ'লে বাঁচা যায় না, কেবল মানুষ নিয়েও বাঁচা যায় না। কোনো মানুষই সব সময় একরকম নয়। তা ছাড়া, ঘটনার সুতো চিরকাল এলোমেলো জাল বুনে যাচ্ছে, তা থেকে আমাদের নিষ্কৃতি নেই। যাকে যখন চাই, পাওয়া যায় না হয়-তো। তার চেয়েও খারাপ, যাকে যখন যে-রকম করে' চাই, তা পাইনে। মনের অনেক রকম অবস্থা আছে; তার উপর আমাদের হাত নেই। আছে ক্লান্তি। আছে উদাসীনতা। আছে ভয়ঙ্কর অবসাদ, সমস্ত

সৌরজগতকে যা লুপ্ত করে' দিতে পারে। সুতরাং অন্য-কোনো আশ্রয় দরকার, নিজের মধ্যে কোনো আশ্রয়।

কী তা হ'তে পারে? মানুষ কী করে' বাঁচে? কী করে' সময় কাটায়? মানুষ কী করে তার জীবন নিয়ে? যথেষ্ট পয়সা থাকলে, হঠাৎ মনে হ'তে পারে, এই ক্লান্তির সঙ্গে ভালো-রকম একবার যুদ্ধ করা যায়। বেড়ানো যায়। পড়া যায়। ডুবে থাকা যায় সামাজিকতার আমোদে। একটু-আধটু মদেও ডোবা যায়—যদি নেহাৎই দরকার হয়। অবসাদ দূর করতে একটা ককৃটেলের মত কিছু নয়।

কিন্তু যখন আমরা এখান থেকে ওখানে যথেষ্ট ছুটোছুটি করলুম; বিভিন্ন চেহারার, বিভিন্ন ঢঙের, বিভিন্ন রঙের যথেষ্ট মেয়ে-পুরুষের সঙ্গে যথেষ্ট মাখামাখি করলুম; যখন আমরা অজ্ঞান হ'য়ে না-পড়া পর্য্যন্ত ককৃটেল খেলুম—তারপর কী? তারপর—ঠোঁটের উপর লেগে-থাকা ক্ষীণ বিস্বাদ, আর আবার সেই ক্লান্তি—আরো ভয়ানক, আরো বিশাল—কেননা এর পরে আর নতুন কিছু করবার নেই, এর পরে সেই একই জিনিসের পুনরাবৃত্তি।

আর-একটা উপায় আছে। কাজ। যে-কাজ আমাদের বাঁধে, যে-কাজ আমাদের কিছু ভাববার সময় দেয় না। এমন মানুষের সংখ্যা পৃথিবীতে চিরকালই কম, যারা কেবল বসে'-বসে' পয়সা খরচ করে' জীবন কাটাতে পারে। বাকি সবাইকে কোনো-না-কোনো রকম কাজ করতে হয়। ভাগ্যিস করতে হয়। নয় তো মানুষ বাঁচতো কী করে'?

কী করে' সহ্য করতো এই জীবন—এই শূন্যতার অর্থহীন প্রসার ?

কাজ আছে দু'রকমের। একটা সহজ, সরস, নিজের ইচ্ছায় সঞ্জাত, আনন্দে উদ্দীপিত। সে-কাজে কোনো ভার নেই, কোনো দায় নেই। পাখি যেমন করে' কাজ করে; যে গাইতে পারে তার গলা দিয়ে যেমন স্বর ফোটে। তা ফুটে ওঠে আমারই ভিতর থেকে, আবার নতুন করে' সৃষ্টি করে আমাকে। নিজের যতখানি তাতে দিই সেটা খোয়া যায় না; সেটা ফিরে আসে নিজের মধ্যে, রূপান্তরিত, বিশুদ্ধ; জমে' ওঠে বিশুদ্ধ রসের প্রেরণায়, আঙুরের নিটোল হৃদয়ের মত।

আজকালকার পৃথিবীতে এ-ধরণের কাজের ক্ষেত্র ক্রমেই সঙ্কীর্ণ হ'য়ে আসছে। যন্ত্র রয়েছে। রয়েছে বিরাট, দুর্ব্বোধ্য অর্থনৈতিক সিস্‌টেম। একজনের আলাদা হ'য়ে কিছু করাটা লোকসান—ধনবৃদ্ধির দিক থেকে। একই উদ্দেশ্য নিয়ে অনেক লোকের একযোগে কাজ করবার যে-সামঞ্জস্য, তারই জোরে তো সিস্‌টেম টিঁকে আছে। ধনস্ফীতিও হচ্ছে, সন্দেহ নেই: কিন্তু যদি জিজ্ঞেস করো সেটা এমন অসমান, মাত্রাহীন, ছন্দহীন কেন, সে আলাদা কথা।

যে-কাজ অন্যের জন্য, যে-কাজ নিছক জীবিকার জন্য, তাতে অভ্যাসের যান্ত্রিক অসাড়তা আসতে বাধ্য। তবু সেটা ভালো, কেননা তাতে সময় কাটে। আর এই কাজও একটা নেশা হ'য়ে উঠতে পারে: আপনি কেবলই কাজ করে' যাচ্ছেন, কেন জানেন না; কেবলই বাড়িয়ে যাচ্ছেন আপনার টাকা,

কেন জানেন না। আজকালকার দিনে এ-ধরণের লোককেও প্রতিভা বলা হয়। হঁ্যা, দানবীর প্রতিভা। কারণ মনের একরকম অসুস্থতা, বিকৃতি ছাড়া এ কিছু নয়। তবু, একটা কেন্দ্র তারা পেয়েছে, একটা আশ্রয়; ক্লান্তিকে তারা পরাস্ত করেছে; জীবনের সমস্যার সমাধান করেছে কোনো একরকম করে'। যদিও, হ'তে পারে, জীবনকে একেবারে অস্বীকার করে'ই তারা তা করতে পেরেছে।

মোটের উপর, কাজকে বাদ দেয়া যায় না, সেটা প্রয়োজন। আর তাই তাকেও তার কাজ খুঁজে নিতে হবে।

আমাদের এই বিরাট সিস্‌টেম প্রায় সব মানুষকেই শোষণ করে' নিয়েছে। মুক্তির রাস্তা আছে কেবল তাদের, যারা বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক, যারা কবি, যারা শিল্পী। ঈশ্বর যদি সেদিক থেকে আপনাকে কিছু দিয়ে থাকেন, তাহ'লে আপনি চেষ্টা করতে পারেন এই পৃথিবীর মধ্যে থেকেও তাকে ফাঁকি দেবার।

আর তার ছিলো একটু লেখার সুড়সুড়ি—একটুখানি ক্ষমতা, এমন কি। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ সে-জন্য। সে-ই তো তার জীবনের শেষ দুর্গ—অনাক্রমণীয়, আনন্দময়। সেখানে সে ভয় করে না একা হ'তে। তা-ই বা কেন—সেখানে সব চেয়ে কম সে একা: সমস্ত কথার আর সুখে-ফেটে-পড়া হাসির শব্দ সে-আনন্দ, সে-সম্পূর্ণতা তাকে দিতে পারে না, যা সে পায় একা ঘরে বসে' এক পাতা কবিতা পড়ে' কি—ঈশ্বর যদি দয়া করেন—কয়েক লাইন কবিতা লিখে। সেই নিঃসঙ্গতায় ধ্বনির আর স্বপ্নের আর ভাবনার ভিড়, সেখানকার নীরবতা বাণীময়।

কিন্তু তবু, নিজেকে মুখোমুখি সে দেখতে চাইতো না, দেখতে পারতো না কখনো। যেটা সত্যিকারের নিঃসঙ্গতা—তার সত্তার সেই অলক্ষ্য, অন্ধকার স্রোত, তাকে সে ভয় করতো। তাকে চাপা দিয়ে রাখতে চাইতো সব সময়। তার দিনের জীবন—তার বন্ধুরা, তার হাসি আর গল্প—সব মিলে রচনা করেছে একটা আড়াল। তার সেই নিজেকে রেখেছে লুকিয়ে। অন্য আড়াল এই আর্ট, যা তাকে জড়িয়ে ধরেছে, যা তাকে ঢেকে রেখেছে, যা তাকে প্রায় দেবতার মত অনধিগম্য করে' তুলেছে। সে ছিলো সুখী, নিজের সেই দূরত্বে, তপস্বীর মত নির্লিপ্ততায়। জীবনের এ-ই তো শেষ সীমা, সে তখন ভেবেছিলো।

এমনি করে' সে কাটিয়ে এসেছে অনেক, অনেকদিন। কখনো সে নিজেকে একা হ'তে দেয়নি। যখন সে একা, তখন সে লিখছে কি পড়ছে। এত ক্লান্ত হ'য়ে শুতে গেছে যে চোখ বোজবার সঙ্গে-সঙ্গেই প্রায় ঘুমিয়ে পড়েছে। যদি কখনো ঘুম আসতে দেরি হয়েছে, উঠে আলো জেলে শুয়ে-শুয়ে বই পড়েছে—যতক্ষণ ঘুমের ভারে বই খসে' না-পড়েছে হাত থেকে। তার বিভীষিকাকে সে সরিয়ে রেখেছে দু'হাতে ঠেলে; নিজেকে কখনো একা থাকতে দেয়নি।

প্রথম যৌবনেই একটা জিনিস সে উপলব্ধি করেছিলো। তা এই যে আমাদের এই মানুষের জগতেই পরিবর্ত্তন আর বিক্ষোভ আর অশান্তি : আর্ট চিরন্তন। মানুষের জগতেই দূরে চলে' যাওয়া আর কাছে আসা, ভালোবাসা আর ভুলে'

যাওয়া : কিন্তু আফ্রোদিতের দীর্ঘ, কালো চুল চিরকাল সমুদ্রের ঢেউয়ে ঢেউয়ের মত জড়িয়ে থাকবে; চিরকাল ঝল্‌মল্‌ করবে হেলেনের বক্ষ গ্রীষ্ম-নিবিড় বনে পাকা আপেলের মত। আর সে তার অন্তরের চোখ ফেরালো আর্টের দিকে : আর সেই দীপ্তিতে পৃথিবী যেন মুছে গেলো। আমার জীবন হোক্‌ আর্টের মধ্যে : মনে-মনে সে বললে। এ-জীবন মায়া—এ-কথা বলবার নতুন একটা ধরণ মাত্র।

যা-ই হোক্‌, সুখ সে পেয়েছিলো। বন্ধু : বই : মাঝে-মাঝে নিজে একটু লেখা। সে একটা কাগজও বার করেছিলো। কাগজ বেশিদিন চলেনি, কিন্তু যে-ক'দিন ছিলো তাকে রেখেছিলো ভরে'।

সেই সময়ে, ঘুম-ভাঙা চোখে সকালবেলাকার আবছায়া আকাশের দিকে তাকিয়ে সে ভাবলে, সেই সময়েই আমি সব চেয়ে সুখী ছিলুম; সে-সুখ আমি আর জানবো না।

কিন্তু সুখ অনেক রকমের আছে; সুখের অনেক স্তর আছে। আমি কি সেই তখনকার সুখ নিয়ে এখন তৃপ্ত হ'তে পারবো? সে ভেবে দেখলে, আর সে অবাক হ'য়ে গেলো আবিষ্কার করে' যে সেই সুখ এখন আর সে চায় না। তাকে সে ছাড়িয়ে এসেছে, তাকে সে ফেলে এসেছে অনেক দূরে। কী চায় সে এখন?

আশ্চর্য্য, মানুষ কী-রকম বদলায়। পদে-পদে আমরা মোহ রচনা করি, আর মনে-মনে বলি, এটাই শেষ, এটাই চরম। কিন্তু একদিন কিছু হয়-তো ঘটে, কি ঘটেও না, আর

সে-মোহ ভেঙে যায়, জীবন খোঁজে নতুন দিগন্ত। তখন দেখতে পাই, এতদিন যেটা ছিলো সেটা কুঁড়ি মাত্র; তাকে ভেঙে দিয়ে, তা থেকে ফেটে বেরিয়ে আসছে এইবার সত্যিকারের ফুল। এমনি, চিরকাল। আবার গড়ে' ওঠে নতুন মোহ; আবার তা ভেঙে যায়; জীবন চিরকাল নিজেকে ছাড়িয়ে যায়। মৃত্যুর দিন পর্য্যন্ত কিছুই শেষ নয়, কিছুই চরম নয়। কেবল পল্লবের পর পল্লবে ফুটে ওঠা : নিজেকে ঝরিয়ে দেয়া, আবার নতুন হ'য়ে ওঠা। জীবনে সুখ কি দুঃখ, ব্যর্থতা কি সাফল্য বলে' কিছু নেই : কেবল আছে এই স্রোত। এই স্রোত, যা কোনোখানেই থামবে না, যা মিশে যাবে এক মৃত্যুর মহাসমুদ্রে।

কিন্তু হয়-তো জীবনে সার্থকতা আছে। এই স্রোত—তা তো চাকার মত ঘুরে-ঘুরে মরে না; একবার যেখানে ছিলো, সেখানে তো আর ফিরে আসে না। তা বয়ে' চলে, তা এগিয়ে চলে। হয়-তো তা আমাদের এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে—কোনো সার্থকতায়, পরিপূর্ণতায়। বার-বার এই ভেঙে পড়া, আর সেই ধ্বংসস্তূপ থেকে বার-বার নতুন হ'য়ে ওঠার ভিতর দিয়ে হয়-তো আমরা পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠছি। জীবন তো গ্রামোফোনের রেকর্ড নয় যে বার-বার নিজের পুনরাবৃত্তি করবে। জীবনে দু'বার কখনো এক সুর বাজে না। যে-অভিজ্ঞতা দু'বছর আগে আমার এসেছিলো, তা আজ যদি আবার আসে, তা মোটেও এক জিনিস হবে না। কেননা আমি তো আর সে-আমি নেই।

হয়-তো, শেষ পর্য্যন্ত, নিঃসঙ্গতাতেই মানুষের চরম পূর্ণতা। হয়-তো—কিন্তু তা এত কঠিন, তাতে এত কষ্ট। এত শক্তি সে-জন্য প্রয়োজন যে মানুষের কাছ থেকে তা আশা করা অন্যায়। কেবল ঈশ্বর একা, আর-কেউ নয়, কেবল ঈশ্বর একা হ'তে পারেন। আমরা যখন বলি, একা থাকতে চাই, তার মানে, মানুষের সঙ্গে মেলামেশার যথেষ্ট হয়েছে এখন।

কেননা কোনো মানুষই নিজের মধ্যে' সম্পূর্ণ নয়। কেন আমরা মানুষের সঙ্গ খুঁজি? কেন আমরা বই পড়ি? শুধু কি সময় কাটাবার জন্য, হালকা একটু আমোদের জন্য? যদি তার মূলে আমাদের অন্তরের কোনো গভীর প্রেরণা না-থাকতো, তাহ'লে মানুষ হ'তো শুকনো কতগুলো হাড়; আর বই যে-কাগজে ছাপা হয় হ'তো তারই মত শুকনো। কিন্তু মানুষ জীবন্ত; আর বইও জীবন্ত—যেহেতু জীবন্ত মানুষের তা সৃষ্টি। যখন একটা বই পড়ি, শুধু কি কতগুলো কথার কুচকাওয়াজ চোখের উপর দিয়ে ভেসে যায়? না, তা প্রাণের তীব্র একটা স্রোত: আমাতে যা সঞ্চারিত হচ্ছে, আমাকে যা ভরে' তুলছে।

আর মানুষ—তার কাছ থেকে আমরা কী চাই? সে সুন্দর হবে, সে ভালো হবে, সে বুদ্ধিমান হবে; ভালো করে' সে কথা বলবে, যেখানে হাসবার হাসতে ভুলবে না। কিন্তু শুধু এই? তা-ই যদি হ'তো, তাহ'লে শেখানো-পড়ানো, মাজা-ঘষা পুতুল নিয়েও তো কাজ চলতে পারতো। সব চেয়ে বড় যার প্রয়োজন, যা না-হ'লে অন্য-কিছুরই কোনো মানে হয় না,

তা এই যে তার মধ্যে থাকবে প্রাণের উষ্ণতা, আগুনের শিখার মত উষ্ণ; আগুনের শিখার মত জলবে তার প্রাণ। সে যখন ঘরে এসে ঢুকবে, নিয়ে আসবে একটা উষ্ণ অনুভূতি; যদি তার হাতের উপর হাত রাখি, চামড়ার নিচে তার রক্তের উষ্ণ স্পন্দন যেন অনুভব করতে পারি।

এমনি করে'ই আমাদের পূর্ণতা আমরা খুঁজি। আর মানুষকে যখন পেয়েছি, আর্জকের মত বই পড়া যখন শেষ হয়েছে, তখন স্তব্ধতা, তখন শান্তি, তখন নির্জ্জনতা। তখন—তার আগে নয়। তখনই ভালো লাগে চুপ করে' বসে' থাকতে, আকাশের দিকে তাকিয়ে চুপ করে' থাকতে; তখনই ছড়িয়ে যাই মেঘে আর পাতায় আর তারায়; তখনই হারিয়ে যাই বিশ্বের নিঃসীম অন্ধকারে। বড় মধুর, সেই নিঃসঙ্গতা। মনে হয়, এর আগে যা-কিছু হয়েছে, যা-কিছু পেয়েছি সব যেন সার্থক হ'য়ে উঠলো এর স্পর্শে।

কিন্তু আগে কিছু পাওয়া চাই : এ যেন আসে সবার শেষে, দিনের শেষে, আমাদের জীবনের রাত্রি-মুহূর্ত্তে।

কেননা অনেক আমাদের প্রয়োজন; অনেকগুলো সুর নিয়ে আমাদের এই জীবন। কোনো-একটা যদি বাদ পড়ে' যায়, তাহ'লে নিজেকে খণ্ডিত, বিভক্ত, অঙ্গহীন মনে হয়।

কিন্তু নিঃসঙ্গতা যদি হয় অভাব—তা থেকে আমাদের রক্ষা করো, দেবতা। নিঃসঙ্গতা যদি হয় অসম্পূর্ণতা, আত্ম-খণ্ডন, অঙ্গহীনতা—তার ভয়ঙ্কর নিষ্পেষণে যদি আমাদের হৃৎপিণ্ড হাঁপাতে থাকে, যদি আমরা মরে' যাই! পৃথিবীতে তার মত

আর-কিছু নয়—এই সীমাহীন শূন্যতার চেতনা : তা আমাদের মুচড়িয়ে ভেঙে ফেলে, ছিঁড়ে ফেলে টুকরো-টুকরো করে'; সেই তীব্র বিষের ধারে আমাদের মাংসের দেয়াল ক্ষয়ে' যায়। তখন কোথায় আমি যেতে পারি? কী আমি করতে পারি? এই যাকে 'আমি' বলছি, তার কতটুকু আর বাকি আছে!

অভাব! জ্বলন্ত, জীবন্ত কোনো অভাব—এক মুহূর্ত্ত যাকে ভুলে' থাকা যায় না। আর তা-ই নিয়ে বেঁচে থাকা!

সেই নিঃসঙ্গতাই কি আজ আমাকে ঘিরছে মৃত্যুর কালো জলের মত, আয়নার দিকে তাকিয়ে সে ভাবলে।

আজকাল বেশির ভাগ সময় তাকে একা থাকতে হয়। বন্ধুরা পৃথিবীর প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে টাকা শিকার করে' বেড়াচ্ছে। তাদের সঙ্গে মাঝে-মাঝে যখন দেখা হয়, তাদের চোখ উজ্জ্বলতরো, তারা কথা বলে দ্রুততরো; তাদের সমস্ত শরীরের ভঙ্গিতে শিকারীর সতর্ক সচেতনতা। এ-খেলায় উত্তেজনা প্রচুর, সন্দেহ নেই। আজকের দিনে জঙ্গলে বুনো জানোয়ার শিকারের চাইতে এই সহরে টাকা শিকারে অনেক বেশি স্নায়বিক শক্তি, অনেক বেশি ধৈর্য্য, আর ধূর্ত্ততা নিশ্চয়ই অনেক বেশি দরকার। যাদের নিয়ে সে জীবন আরম্ভ করেছিলো, যাদের উপর সে নির্ভর করেছিলো, যাদের মুখ থেকে সে কখনো তার উৎসুক চোখ ফেরায়নি, তারা আস্তে-আস্তে দূরে সরে' যাচ্ছে। যাবেই। সে কী করে' বাধা দেবে, ভাগ্যকে বেঁধে রাখবে কেমন করে'? জীবনই তো এই।

যাকে ভালোবাসি সে কেন দূরে চলে' যায়, চিরকাল মানুষের

এই কান্না। ঘটনা তাকে ঠেলে নিয়ে যায় দূরে, মৃত্যু তাকে কেড়ে নিয়ে যায়। কিন্তু, অত বেশি কষ্টের যদিও নয়, তবু এক হিসেবে সব চেয়ে ভয়াবহ, সব চেয়ে নিষ্ঠুর এই অলক্ষিত, মন্থর বিচ্ছেদ ; যখন কাছাকাছি থেকেও দিনের পর দিন আমরা পরস্পরের দূরে সরতে থাকি ; যে-সংজোযনা আমাদের মধ্যে ছিলো তা নষ্ট হ'য়ে যায়, যে-উদ্দীপনা আমাদের মধ্যে জ্বলেছিলো তা নিবে যায়।

অনেকদিন থেকেই সে তা বুঝতে পারছিলো, যদিও নিজের কাছে সে তা স্বীকার করবে না। একটা অভাব মাথা খুঁড়ে মরছিলো তার মধ্যে। কিন্তু তাকে ভাষা দিতে তার ভয়।

কিন্তু আজ আর তাকে ঠেলে রাখা গেলো না, বসন্তের এই সকালবেলায়। তা উথলে উঠলো উত্তপ্ত, দুঃসহ স্রোতে তার বুকের ভিতর থেকে। একটা কষ্ট, প্রায় শারীরিক কষ্টের মত। টন্‌টন্‌ করছে তার হৃৎপিণ্ড, যেন তা এখনই ফেটে যাবে।

চায়ের সঙ্গে সে খবরের কাগজ খুললো, কিন্তু একটা লাইন সে পেলো না পড়বার মত। ছবির পাতার দিকে একটুখানি তাকিয়ে থেকে সে সেটা ফেলে দিলে ছুঁড়ে। চিঠি-এলো ; চিঠিগুলো একবার হাতে তুলে দেখে সে আবার রেখে দিলে, একটাও খুললে না।

এখন এই তো সমস্ত দিন পড়ে' আছে তার সামনে। এ নিয়ে কী করা যায় ?

সে উঠে দাঁড়ালো। তার বুকের উপর সমস্ত সময়ের যেন ভার। সে ভাবলে একটা বই পড়ে, কি কিছু লেখে, কিন্তু

দুটো কাজই অসম্ভব মনে হ'লো। যদি সে একটা বই খোলে তাহ'লে তার ভিতর থেকে এই যন্ত্রণাই লাফিয়ে উঠবে সাপের মত। আর, কী সে এখন লিখতে পারে, তাকে ঘিরে এই শূন্যতা, মৃত্যুর এই কালো জল ?

আর সে বুঝতে পারলে যে আর্টের উপর বড় বেশি আস্থা সে রেখেছিলো। আর্ট থেকে অনেক শান্তি পাওয়া যায়, অনেক শক্তি ; কিন্তু জীবনের কোনো দুঃসহ ভীষণ রূপ যখন ভেঙে পড়ে বুকের উপর, তখন যাকে সে দুর্গ বলে' জেনেছে তা ছিঁড়ে উড়ে যায় প্রচণ্ড ঝড়ের মুখে তাঁবুর মত। আর একেই সে আশ্রয় করেছিলো, সে বেঁচেছিলো এরই মধ্যে। জীবনকে মুখোমুখি দেখতে সে চায়নি ; তার চোখ ছিলো আর্টের উপর। আজ জীবন নিচ্ছে তার প্রতিশোধ। সে যেন উপড়ে পড়ছে, মূলস্থদ্ধ। যেখানে চিরন্তনতা, যেখানে অখণ্ড শান্তি, যেখানে অনির্ব্বচনীয় সম্পূর্ণতা—সেই সমস্ত আজ ছোট ছেলের হাতের এলোমেলো আঁকিবুকির মত অর্থহীন। বড় ভয়ঙ্কর—জীবন যখন বুকের উপর ভেঙে পড়ে, উত্তপ্ত, অনবগুণ্ঠিত, স্পন্দমান জীবন। কী ব্যথা! আমাদের সমস্ত সাহস আর সমস্ত শক্তি একত্র করে'ও তাকে সহ্য করা যায় না। জীবন যখন বুকের উপর তার দুরন্ত, উন্মত্ত ঝাপটা মারে, তখন রক্ত ঝরবেই, রক্ত ঝরবেই হৃৎপিণ্ড দিয়ে—তখন আমাদের একমাত্র প্রার্থনা এই হ'তে পারে একেবারে যেন মরে' না যাই।

তাই, এই বাঁচাই বোধ হয় আমাদের সব চেয়ে বড়

সাধনা : জীবনকে সহ্য করা, জীবনকে পরিপূর্ণ করে' তোলা। আর তারপর আর্ট।

এই সহজ কথাটা বুঝতে এত সময় নিলে, সে ভাবলে।

কিন্তু যদি কোনো উপায় থাকতো, কোনো মুক্তি! কোনো নেশা, হৃদয়কে যা দিয়ে অসাড় করে' ফেলা যায়; যাতে ঘুমিয়ে পড়া যায়—দীর্ঘ, নীরন্ধ্র ঘুম। এ কী ভয়ানক যে ব্যথা থেকে কোনো মুক্তি নেই, জীবনে ব্যথা থেকে কোনো মুক্তি নেই।

বাড়ি থেকে একটু বেরোলেও হয়, সে ভাবলে। কাছেই আছে বন্ধুর বাড়ি, হয়-তো আরো দু'একজন সেখানে আসবে। কী উৎসুকতা, মানুষের কণ্ঠস্বর শোনবার জন্য কী উৎসুকতা। কথা, কথা, কথা: মর্ফিয়া। টন্‌টন্ করে' যেখানটা ছিঁড়ে পড়ছে, তখনকার মত একটু অবশ করে বটে। আর তবু, সমস্ত কথার আড়ালে, সমস্ত কথা ছাড়িয়ে বুকের মধ্যে যা শিরশির, শিরশির করছে সব সময়, তাকে কী করে' চাপা দেবো?

তবু—তবু তাকে যেতেই হবে মানুষের খোঁজে; যে-সব কথা কোনোরকমেই তার জীবনের অংশ নয়, তা-ই শুনতে, আর বলতে। যা-ই হোক্, এই শূন্যতার চেয়ে সেটা ভালো। এ আর আমি সইতে পারছিনে, এই শূন্যতা।

বাক্স থেকে জামা খুলে সে পরতে গেলো। আর দেখলো, একটা বোতাম নেই জামায়। হাতের কাছে একটা সেফ্‌টিপিন নেই। বাধা পেয়ে সে থমকে গেলো:

আর রাগের একটা সূক্ষ্ম স্রোতে তার শরীরের শিরা জ্বলতে লাগলো।

আর হঠাৎ, হঠাৎ, অত্যন্ত সহজে, অত্যন্ত নিশ্চিতভাবে সে ঠিক করে' ফেললে সে বিয়ে করবে।

হয়-তো তাতে তার এই নিঃসঙ্গতা ভেঙে যাবে, বুকের উপর থেকে সরে' যাবে সময়ের ভার। আনন্দের উন্মত্ততা তাতে থাকবে না হয়-তো; থাকবে শান্তি। আর এখন তা-ই তো সে চায়: শান্তি। এ-রকম ভেঙে-চুরে যাওয়ার আর কত? আর-একজনের সঙ্গে যদি মিলতে পারি, আর-একজনের স্রোত যদি আমার স্রোতে এসে মেশে, তাহ'লে কি জানবো না সেই প্রচণ্ড, অখণ্ড শান্তি; সেই স্তব্ধতা, বাতাসে যার বিদ্যুৎ? বেশি কথা থাকবে না—কথার কী দরকার? নীরব, উষ্ণ একটা আশ্বাস—তা ছাড়া আর কী চাই? একটা আশ্বাস: ভয় নেই, ভয় নেই। জীবনকে ভয় কোরো না। হৃদয়ে উষ্ণতার স্পর্শ, রক্তে উষ্ণ অনুভূতি, নিবিড়, নীরব রক্ত-সংস্পর্শ। আর কী চাইতে পারে মানুষ? তখন আমি আর জীবনকে ভয় করবো না, তখন আমি জীবনের চোখের দিকে তাকাবো, জীবনকে নেবো দু'হাত ভরে', নেবো বুকের মধ্যে, আমার রক্তের স্রোতে। পাথর ভেঙে ফেলো: আমার এই পাথরের হৃদয় সরিয়ে দাও; আমাকে দাও জীবন্ত মানুষের হৃৎপিণ্ড যা গাঢ় উত্তপ্ত, স্পন্দমান রক্ত সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে দেবে, সমস্ত সত্তায়।

জামাটা সে ছুঁড়ে ফেলে দিলে হাত থেকে : তারপর বসে'-বসে' ভাবতে লাগলো কাকে বিয়ে করা যায়। অনেক মেয়েকে সে চেনে। তারা সবাই সহরের; তাদের মধ্যে সহুরেপনার রক্তহীনতা কোনো-না-কোনো ভাবে যেন আছেই। তারা এত চমৎকার—এত ভালো করে' তারা কথা বলতে পারে, হাসতে পারে এমন মানানসই করে' : তবু ভিতরে-ভিতরে তারা যেন শুকনো, তাদের রক্ত যেন পাৎলা; কোথায় তাদের বিবর্ণতা, কোন্ গোপন অদৃশ্য উৎসে তারা শুকিয়ে যাচ্ছে। এক-এক করে' সকলের কথা সে ভাবলে। তাদের অনেককেই তার ভালো লাগে। কোনো-কোনো মেয়ের প্রতি তার শ্রদ্ধা আছে মনে-মনে। দু'একজন আছে, যাদের বুদ্ধিতে, মনের দীপ্তিতে মুগ্ধ না-হ'য়ে সে পারে না। কিন্তু সে কি তা-ই চায়—বুদ্ধি? মনের দীপ্তি?

একজনের কথা তার মনে পড়লো। ক্ষীণ তার শরীর। বেশি কথা সে বলে না। বড় আর কালো তার চোখ। আর সেই চোখ তুলে কেমন করে' সে তাকায়! বার-বার তা মনে পড়ে।

তাই সে বাক্স থেকে আর-একটা জামা বার করে' পরলে, একবার তাকালে নিজের দিকে আয়নায়, তারপর বেরুলো রাস্তায়। কী বোকা আমি, যেতে-যেতে সে ভাবলে, এতদিন আমি জানিনি কোথায় রয়েছে আমার পূর্ণতা।

মিনু বসে' ছিলো সেলাই হাতে নিয়ে; সে কাছে যেতে চোখ তুলে একবার তাকালো। কিছু বললে না।

'তোমার পাশে একটু বসতে পারি?' সে বললে।

মিনু একটু সরে' জায়গা করে' দিলে তার জন্য।

'রাখো তোমার সেলাই। কথা আছে।'

সেলাইয়ের উপর আরো একটু ঝুঁকে পড়ে' মিনু বললে, 'বলো না।'

একটু চুপ করে' থেকে সে বললে, 'তুমি কি আমাকে বিয়ে করবে?'

মিনুর সক্রিয় আঙুলগুলো স্তব্ধ হ'য়ে গেলো। তার কালো চোখের দৃষ্টি লুটিয়ে পড়লো তার মুখের উপর। দাঁত দিয়ে সেলাইয়ের বাড়তি সুতোটা কেটে ফেলে' সে বললে, 'আমি কেন তোমাকে বিয়ে করবো?'

'কেনই বা করবে না?'

মিনু মাথা নিচু করলো; তার ক্ষীণ আঙুলগুলো আবার চঞ্চল হ'য়ে উঠলো সেলাই নিয়ে। আস্তে-আস্তে সে বললে, 'এখনো—এখনো নয়।'

'কখনো, তাহ'লে?'

'কে জানে!'

কিন্তু তবু সে বসে' রইলো; এই উত্তর নিয়েই সে চলে' যেতে পারে না। রুমাল বার করে' সে ঘাড় মুছলো একবার। তারপর বললে, 'আমি কি ভুল করেছি?'

মিনুর মাথা আনত; আর তার কালো চুলের মাঝখানে

দীর্ঘ ভাগ-রেখা তার চোখের সামনে আশার উজ্জ্বল রাস্তার মত জ্বলে' উঠলো।—'না, ভুল করোনি,' মিনু বললে।

'তবে ?'

নরম, ক্ষীণস্বরে মিনু বললে, 'ঈশ্বরের মনে যা আছে, তা-ই হবে।'

'আর তোমার মনে কী আছে জানতে পারিনে ?'

মিনু রেখে দিলে সেলাই।—'কেন জানতে চাও ?' তার স্তব্ধ, কালো চোখ তুলে সে বললে, 'তোমার ইচ্ছা দিয়ে তুমি কী ঘটাতে পারো ?'

কপিল—নাম তার কপিল—বুঝতে পারলে। উঠে দাঁড়িয়ে সে বললে, 'একদিন হয়-তো সময় আসবে।' বলে' চলে' গেলো।

২

বাড়ি ফিরে এসে তার মনে পড়লো আর-একজনের কথা। যাকে, কোনো-এক সময়ে, সে ভালোবেসেছিলো। একমাত্র ভালোবাসার 'ব্যাপার', তার জীবনে।

বয়েস তখন অল্প ছিলো। জীবনে ছিলো সুখ; নতুন যৌবনের উদ্দীপনা। বসন্তের গাছে যেমন নতুন, সবুজ পাতার রাশি, তেমনি তার জীবনে তখন আশা আর স্বপ্ন আর সঙ্কল্প আর নতুন অনুভূতির ভিড়। আর সেই উন্মীলনের একটা মঞ্জরী, সেই মেয়ে, বাণী। একটি মেয়েকে না-হ'লে সে-সময়কার ছবি অবিশ্যি সম্পূর্ণ হয় না।

গ্যয়টে ছিলেন একজন মানুষ যিনি সমস্ত জীবন ভরে' প্রেম করে' গেলেন—আত্মার সমৃদ্ধির জন্য। যেমন আমরা ব্যাঙ্কে টাকা জমাই, আর বড়লোক হ'য়ে উঠি; তেমনি আমরা আত্মায় প্রেম জমাই, আর বড় হয়ে উঠি! নিখুঁত হিসেব! চোখ খুলে রাখো, কোনো সুযোগ হারিয়ো না: কোন্ অভিজ্ঞতা তোমার আত্মায় সোনার টুকরো হ'য়ে উঠতে পারে, কিছুই বলা যায় না।

এম্‌নি, বিরা[illegible] মনের বিরাট আত্ম-প্রেম। আর তারা একদল আছে [illegible]দের জীবনের মূল কথা হচ্ছে 'অভিজ্ঞতা'।

অভিজ্ঞতা: কিনা, যে-সব স্ত্রীলোকের সংস্পর্শে তুমি এসেছো তাদের সংখ্যার আধিক্য। সংখ্যাটা যত বড়, তত বেশি তারা 'পেলো'। বছরের পর বছর তারা খাঁজ কেটে-কেটে যায়, আর মোট অঙ্কটার স্ফীতিতে গর্ব্বে আর সুখে বুক তাদের ভরে' ওঠে। ওঃ, কখনো কোনো সময় নষ্ট হয়নি, এ-কথা মনে করবার তৃপ্তি!

কিন্তু সে ছেলে ছিলো লাজুকগোছের—মেয়েদের সঙ্গে বিশেষ করে' লাজুক। কখনো সে এগিয়ে যাবে না। সব সময় সে সরে' দাঁড়াবে, ছেড়ে দেবে। আর হয়-তো, শেষ পর্য্যন্ত, সেটাই ঠিক—কেননা জীবনেই আছে অপব্যয়, যন্ত্রে নেই। যন্ত্র মিনিট ধরে' নির্দ্দিষ্ট একটা বস্তুর পরিমাণ উৎপাদন করতে পারে: লক্ষ বীজের অপব্যয়ে একটা ফুলের সৃষ্টি। আর সে চেয়েছিলো সৃষ্টি করতে।

আর তাকে সৃষ্টি সে করেছিলো, সেই মেয়েকে। একদিন সে তাকে দেখলে, আয়নার সামনে বসে' খোঁপা বাঁধছে বিকেলের আলোয়; অসমাপ্ত প্রসাধনের সৌরভ তার গায়ে। চমকে উঠলো তার মন। এ কী! রাস্তায় হাঁটতে-হাঁটতে অবাক হ'য়ে সে ভাবলে, এ কী! আমি কি প্রেমে পড়ছি?

মন ঠিক করতে অনেক সময় সে নিয়েছিলো—কি নিতো, যদি না বাণী নিজেই আসতে এগিয়ে। আর তারপর, যত কবিতা সে পড়েছিলো, যত কল্পনা তার মনকে কোনো-না-কোনো সময়ে হানা দিয়েছে, সে-সমস্তর সঙ্গে বাণী জড়িয়ে গেলো, মিশে গেলো; উঠে এলো সেই তরুণ কবি-মনের স্বপ্ন-

সমুদ্র থেকে, একদিন আফ্রোদিতে যেমন উঠে এসেছিলো ঢেউয়ের সমুদ্র থেকে। কিন্তু আফ্রোদিতে সে নয়, প্রেমের জননী সে নয় : তার মধ্যে ছিলো না সেই অপরিসীম, অনির্ব্বচনীয় কোমলতা। তা তো তারই কোমলতা, তারই স্নেহ, যে-সমুদ্র থেকে আফ্রোদিতে উঠে এসেছিলো : যে-স্নেহে বুক ভরে' যায়, যে-বিশাল স্নেহ সীমাহীন, সময়হীন শূন্যতার মধ্যে একদিন প্রাণকে এনেছিলো, তা না-হ'লে প্রেমের দেবতার কি সৃষ্টি হ'তে পারে?

না, যদি কোনো দেবীর সঙ্গে তাকে তুলনা করতেই হয় সে আর্টেমিস, বনের ছায়ায় এইমাত্র মিলিয়ে গেলো যার উজ্জ্বল, উন্মুক্ত চুল; যে হানা দেয়, স্বপ্নকে যে হানা দেয়, ঘুমের নির্জ্জনতা যে ভরে' রাখে। রাত্রি যার, আর রাত্রির অরণ্য, আর চাঁদের অপরূপ কান্তি, চাঁদের ঐশ্বর্য্য। তাকে ঘিরে ছায়া, তাকে ঘিরে রহস্য। সে নয় নগ্ন আর নিঃসঙ্গ আর বিশুদ্ধ আফ্রোদিতের মত।

কপিল তাকে সৃষ্টি করেছিলো কবিতার ইন্দ্রজাল থেকে, আর সে অবিশ্রান্ত স্ফীত করে' তুলেছিলো কপিলের অন্তরের কবিতার স্রোত। এমন পরিপূর্ণ দেয়া-নেয়া আর হয় না। যা থেকে তার উদ্ভব, বাণী তাকেই আবার নতুন করে' তুললো। কপিলকে সে-ই তো হাতে ধরে' নিয়ে গেলো আর্টের রহস্য-মর্ম্মে। এতদিন সে যেন বাইরে অপেক্ষা করেছিলো, সেই বিশাল প্রাসাদের বাইরের কারুকার্য্য শুধু দেখছিলো মুগ্ধ হ'য়ে। আজ সে খুঁজে পেলো ভিতরে

যাবার রাস্তা। সেখানে বাণী মশালের মত জ্বলছে তার সামনে। যা-কিছু সে পড়েছিলো, সব আবার পড়তে হ'লো নতুন করে'। স্তব্ধ হ'য়ে গেলো সে বিস্ময়ে, সম্ভ্রমে, ভয়ে। কয়েকটা কথার মধ্যে এত থাকতে পারে, কে জানতো।

আমি যদি এত বেশি কবিতা না-পড়তুম, মনে-মনে সে বললে, তাহ'লে হয়-তো তাকে ভালোবাসতুম না। যদি তাকে ভালো না-বাসতুম, তাহ'লে হয়-তো কবিতাকে জীবনে এমন করে' পেতুম না। সত্যি, কাকে আমি ভালোবেসে-ছিলুম—কবিতাকে, না সেই মেয়েকে ?

যা-ই হোক্, তাতে মধুরতা ছিলো, তাদের সেই ভালোবাসায়। তাতে মধুরতা ছিলো, আনন্দ ছিলো, কান্না ছিলো। ছিলো না স্নেহ, সত্যিকারের স্নেহ। বোধ হয় অল্প বয়েসে সেটা আসে না। বোধ হয় স্নেহ জীবনের দুরূহতম সিদ্ধি। অনেক বছরের অনেক দুঃখের, অনেক বিপ্লবের, অনেক মৃত্যুর ও নব-জন্মের পরে তবে তা পাওয়া যায়।

কাঁচা বয়েস ভালোবাসতে পারে না, তা বড় বেশি আচ্ছন্ন থাকে নিজের মধ্যে। তখন থাকে নতুন আত্ম-সচেতনতার গর্ব্ব। তখন থাকে স্পর্দ্ধার অজ্ঞান নিষ্ঠুরতা। নিজের একটু লাগবে সেই ভয়ে অন্যকে দ্বিগুণ মারতে তখন আমরা কুণ্ঠা করিনে। যতদিন নিজে ব্যথা না-পেয়েছি, অন্যকে ব্যথা দিতে আমরা ভাবিনে : ততদিন স্নেহ আসে না।

ভালোবাসা, কপিল ভাবতে লাগলো, তা ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদের মত। তার কাছে আমরা আনত হ'বো—গর্ব্বহীন,

লজ্জাহীন, ভয়হীন—নিজেকে নিঃশেষে সমর্পণ করবো তার কাছে। ফেলে আসবো আমাদের সব পরিচয়, সব অভিজ্ঞান —বাইরে থেকে যত জিনিসে আমরা জড়ানো—কেবল নিজেকে নিয়ে যাবো, নিরাভরণ, নিরাবরণ নিজেকে —তবে যদি পাই ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ। আমাদেরও হ'তে হবে আফ্রোদিতের মত নগ্ন, শুভ্র, বিশুদ্ধ : তবে যদি প্রেমের জন্ম দিতে পারি।

কিন্তু সে-সময়ে, কপিল ভেবে দেখলে, সে-সময়ে আমি ছিলুম আর্টে আচ্ছন্ন হ'য়ে, আমার মুখ ছিলো ঢাকা। আর তাকেও আমি দেখেছিলুম আর্টের জ্যোতির্মণ্ডলের মাঝখানে : তাকে দেখতেই পাইনি, সত্যি বলতে। সত্যি বলতে, পরস্পরকে আমরা কখনো দেখিনি। আমরা শুধু একে অন্যের মধ্যে নিজেদের পোষা স্বপ্নকে দেখেছিলুম।

আর তাই, তাদের সেই ভালোবাসা ঠিক ফুলের মত হ'য়ে উঠতে পারেনি। ঠিক ফুটে উঠতে পারেনি, ফুল যেমন করে' ফোটে। কোথায় যেন একটু জোর ছিলো। একটু চেষ্টা। হৃদয়াবেগ নিয়ে টানা-হেঁচড়া। কখনো হয়-তো নিজেদের ফেনিয়ে তুলতে হ'তো, তারা তা বুঝতে পারতো না। আমি, আমি! এই 'আমি'র বেড়াজাল থেকে তারা সত্যি-সত্যি বেরিয়ে আসতে পারতো না কখনো। আমি ভালোবাসছি, আমি পাচ্ছি ভালোবাসা। তারা তা ভুলতে পারতো না, পরস্পরকে ভুলতে পারতো না। ভুলতে দিতো না, এমন কি। বসে'-বসে' ভাবতো, দেখতো তাদের স্বপ্ন। সেই স্বপ্নের প্রতি

অদ্ভুত নিষ্ঠা তাদের : তা থেকে তারা ভ্রষ্ট হ'তে পারে না মুহূর্ত্তের জন্য।

তার তবু, তাতে মধুরতা ছিলো। বাণী ছিলো তার মনের মত মেয়ে। সে হাসতে পারতো। সে খুসি হ'তে পারতো। তার ভালো লাগতো তার কাছে থাকতে, তাকে দেখতে, তার কণ্ঠস্বর শুনতে। আর তাদের সেই সমস্ত দীর্ঘ, দীর্ঘ আলাপ— দীর্ঘ দুপুর ভরে', দীর্ঘ সন্ধ্যা ভরে' অবিশ্রান্ত তাদের কথা বলা! বোধ হয় সেই কথাতেই তাদের চরম সংস্পর্শ, তাদের সব চেয়ে বড় সুখ। বোধ হয় চুপ করে' থাকতে তারা একটু ভয় করতো মনে-মনে ; ভয় করতো অন্য রকমের সংস্পর্শ।

যদিও সেটাও ছিলো। থাকতেই হবে। একটা অনিবার্য্য অংশ, তাকে বাদ দেয়া যায় না। কিন্তু বাদ দিতে পারলেই যেন ভালো হ'তো। অনিবার্য্য : কিন্তু যতখানি প্রাধান্য তাকে দেয়া হয়েছে, ঠিক তার যোগ্য কি? অবিশ্যি মূলে সেটা আছেই। গভীর, গভীর মূলে। ওকে যে-রকম ভালোবাসি, ও-রকম করে' কোনো পুরুষকে ভালোবাসা যায় না। ও মেয়ে বলে'ই ওকে এই বিশেষ ধরণে ভালোবাসছি। কিন্তু এই পর্য্যন্ত। আর তারপর? আমাদের শরীর সম্পূর্ণরূপে আমাদের মনের দাস—সে-ই তো সভ্যতা। আমরা বাঁচি তো মন দিয়েই, শরীর তার কতগুলো প্রতীক রচনা করে মাত্র। কে বলবে এই কথা বলার আনন্দই সব চেয়ে বড় নয়, সব চেয়ে ভালো নয় দূরে গিয়ে মনে-মনে ভাবা?

এমনি সে ভেবেছিলো, সেই সময়ে। তখনও সে জানেনি

কথা বলার অপরিসীম ক্লান্তি, ভাবনার অবরুদ্ধ অন্ধকার। আমরা যা চাই, তা মুক্তি। নিজের মধ্যে বন্দী হ'য়ে আছি, তা থেকে মুক্তি চাই। যেখানে আমি ছাড়া কিছু নেই, সেই ধূসর নিঃসঙ্গতা থেকে যেতে চাই আরক্ত, উত্তপ্ত সংস্পর্শের পূর্ণতায়।

আর বাণীকে যখন তার ছাড়তে হ'লো, বড় লেগেছিলো তার; কিন্তু তার চেয়েও বেশি তার রাগ হয়েছিলো— বাণীর উপর, তার নিজের উপর, সমস্ত পৃথিবীর উপর রাগ। তখন পর্য্যন্ত দুঃখে অনভ্যস্ত, তাকে যে এই কষ্ট পেতে হবে, এটা তার কাছে প্রকৃতির একটা নির্লজ্জ ব্যভিচারের মত লেগেছিলো। বিদ্রোহে জ্বলে' উঠেছিলো তার নবযৌবনের অভিমান। দুঃখকে গ্রহণ করবার নম্রতা আর সাহস তার ছিলো না : সে তাকে লড়বেই, তাকে মাড়িয়ে যাবেই পায়ের তলায়—যদি সেই সঙ্গে নিজের হৃৎপিণ্ডও মাড়িয়ে যেতে হয়, তা-ই হোক্।

আর খানিকটা সময় সে ছিলো তিক্ত আর কঠিন আর নিষ্ঠুর। সে মরে' ছিলো।

সে মরে' ছিলো, সে বেঁচে উঠেছিলো। বেঁচে উঠেছিলো নতুন হ'য়ে। যাতে নতুন হ'য়ে উঠতে পারি, সেইজন্যই মাঝে-মাঝে মরতে হয়।

আশ্চর্য্য, মানুষ কী-রকম বদ্‌লায়। এ-কথা যখন বলি, 'আমি অসুখী', তার মানে এ নয় যে সুখী হবার কোনো উপকরণ আমার হাতে নেই। যদি তা-ই হ'তো তাহ'লে

কি এত লাগতো মনে? তাহ'লে বাইরের কোনো কারণকে দোষ দিয়ে একটু সান্ত্বনা কি পাওয়া যেতো না? তা তো নয়: অনেক উপকরণ হয়-তো আছে কিন্তু সে-সব আমি ছাড়িয়ে এসেছি। মন খুঁজছে কোনো নতুন, কোনো গভীরতরো তৃপ্তি। তা পাবো কোথায়? জীবনে দুঃখের এ-ই তো একটা মূল উৎস যে আমরা এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকিনে; পুরোনো বাঁধ ভেঙে কেবলই বেরিয়ে যাই, কেবলই এগিয়ে যাই; কিন্তু আমাদের গায়ে লেগে থাকে পুরোনো অভ্যাসের আঁশ, পুরোনো জীবনের অনুষঙ্গ একেবারে হঠাৎ ভেঙে ফেলতে পারিনে। আর নতুন বাসনার উন্মেষ সঙ্গে-সঙ্গেই তো তার পরিপূর্ণতা নিয়ে আসে না: অপেক্ষা করতে হয়—আর দুঃখ পেতে হয়।

সেই চুপচাপ, অলস দুপুরবেলায়, বাণীর কথা মনে করে' তার ভালো লাগলো। এতদিন পরে, কতদিন পরে! এখনো মনে করতে ভালো লাগে। সত্যি, প্রথম প্রেম ভোলা যায় না। তবু, তাদের যে চিরকালের মত ছাড়াছাড়ি হয়েছে, ভালোই হয়েছে সেটা। তার দিন ছিলো: তার দিন গেছে। এতদিন ধরে' তাকে সঙ্গে-সঙ্গে টেনে আনলে কিছুতেই চলতো না। আসতেই হ'তো কোনো-না-কোনো দিক থেকে ভাঙন। বাইরে থেকে না-এলে, নিজেদেরই ভিতর থেকে। তবু ভালো যে বাইরে থেকেই তা এসেছিলো। তবু ভালো যে তাদের ছাড়াছাড়ি হয়েছিলো অশ্রুতে আর চুম্বনে। তবু ভালো যে স্মৃতির চিরন্তন অরণ্য বসন্তের মত মধুর।

সে একটু চোখ বুজলো, আর সেই অন্ধকারে ফুটে উঠলো বাণীর মুখ। ম্লান, অত্যন্ত ম্লান—এত ম্লান তো সে কখনো ছিলো না। বালিসে মাথা রেখে সে শুয়ে আছে, একটু খোলা তার ঠোঁট। কপিল অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলো। ক্লান্তি জড়ানো তার মুখে। সে যেন মরছে। সে মরছে, মরে' যাচ্ছে। আর এই তো আমি তার দিকে তাকিয়ে আছি: আমার চোখের উপর আস্তে-আস্তে সে মরছে। আমি তাকে মরে' যেতে দিচ্ছি।

আকাশের গায়ে স্বচ্ছ সাদা মেঘ জড়ানো, যেন উর্ব্বশীর শরীর থেকে ওড়না খসে' পড়েছে। কপিল সেদিকে তাকিয়ে রইলো চুপ করে'। সে চাইলো স্তব্ধ হ'য়ে যেতে, একেবারে স্তব্ধ: চুপচাপ, চুপচাপ শুয়ে থাকা এই দীর্ঘ উষ্ণ দুপুর ভরে'। সে কিছু করবে না, সে কিছু ভাববেও না। শুধু চুপ করে' থাকবে তার নিজের মধ্যে। বিশ্ব চঞ্চল: তার সমস্ত গ্রহমণ্ডল আর তারার পুঞ্জ আর নীহারিকারাশি নিয়ে চিরকাল ঘূর্ণ্যমান, কোটি-কোটি মৃত্যুর অন্ধকারের ভিতর দিয়ে চিরকাল ধাবমান; কিন্তু কোনোখানে, তার অন্তরে কোনোখানে নিশ্চয়ই আছে শান্তি; আছে অপরিসীম, অনশ্বর স্তব্ধতা। আর আমাদের হৃৎপিণ্ড ঢিপ্‌ঢিপ্ করে' ভেঙে পড়তে চাইছে; আর আমাদের রক্তের তীব্র স্রোত টেনে তুলছে বাসনার আর হতাশার ফেনা; কোন্ দুর্ব্বার প্রচণ্ড প্রাণ-রস বয়ে' যাচ্ছে আমাদের দেহ-তরুর শাখায় আর পাতায়, আমাদের প্রতি অঙ্গে, প্রতি

মুহূর্তে : তবু দাও, আমাকে দাও অন্তরের সেই স্তব্ধতা, সেই ধ্বংসহীন শান্তি; আমাকে শক্তি দাও চুপ করে' থাকবার।

কিন্তু কী করে' পাওয়া যাবে তাকে? আর যতক্ষণ পাওয়া না-যায়, একে কী করে' সহ্য করবো?—এই ক্লান্তি, এই নিঃসঙ্গতা? আমি যে মরে' যাচ্ছি, কপিল মনে-মনে বললে, আমি যে মরে যাচ্ছি।

কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে তার লজ্জা হ'লো, নিজেকে প্রশ্রয় দিতে আরম্ভ করলে তার শেষ কোথায়? যা-ই হোক্ না, মনের মধ্যে মেনে নাও। কিছু বোলো না : মনে-মনে, নিজের কাছেও বোলো না। তা চলুক্ তার নিজের স্রোতে, নিজের ধারে নিজেকে ক্ষয় করে' যাক্ : বলে' তাকে আরো শক্তি দেবে কেন?

কী দীর্ঘ মনে হচ্ছে এই দুপুরবেলাটা। আর এমন চুপচাপ। সময় যেন ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছে। সে ঘড়িটার দিকে তাকালো; শুনলো তার টিকটিক—সময়ের ক্ষীণ হৃৎস্পন্দন। ঘড়িটার কোনো ভাবনা নেই; সে কখনো ভুল করে না, তাড়া করে না; তার কাঁটা এক জায়গা থেকে আর-এক জায়গায় আসতে যতটা সময় নেবার তা-ই নেয়। কিন্তু আমাদের পক্ষে কী কষ্ট—কী কষ্ট সেইটুকু রাস্তা পার হ'য়ে আসতে, কী কষ্ট, যখন রুদ্ধশ্বাসে, কান পেতে শুনতে হয় প্রতিটি মুহূর্তের পায়ের শব্দ।

ভালো লাগে না। ঐ একটা কথা সমস্ত প্রাণ দিয়ে

সে ঘৃণা করে : ভালো লাগে না। সব সময় কি ভালো লাগতেই হবে? মাঝে-মাঝে যদি ভালো না-ই লাগে, অত ভয় কেন তাকে? মাঝে-মাঝে ভালো তো লাগবেই না। চুপ করে' সহ্য করো সেটা, মুখ দিয়ে তা এনো না কখনো। সেটা রোগ, সেটাকে লুকিয়ে রাখো। নিজের করুণার উপর, অন্যের দয়ার উপর জুলুম কোরো না।

কতদিন, কত লোককে সে এ-সব কথা বলেছে। আর আজ তার নিজেকেই বলতে হ'লো : ভালো লাগে না। কী লজ্জা, কী অবমাননা। সে চোখ বুজলো; নিশ্চল, নিঃশব্দ। নিজের চারদিকে সে রচনা করবে শূন্যতা। নিজেকে সে লুপ্ত করে' দেবে। লুপ্ত করে' দেবে তার এই তৃষ্ণার্ত, করুণাপ্রার্থী সত্তাকে।

তার ঘরে বই, কেবল বই। যে-সব আত্মা তাকে লালন করেছে; তাকে দিয়েছে শক্তি, দিয়েছে শান্তি, সেই সমস্ত মহান, মৃত্যুহীন আত্মার উপর এক-এক করে' সে মন বুলিয়ে গেলো। যদি সে একটু হাত বাড়ায়, তাহ'লেই তাদের পেতে পারে : ছাপার পৃষ্ঠা থেকে তার মুখের উপর এসে লাগবে জ্বলন্ত নিঃশ্বাস, আর তবু সে নিশ্চল হ'য়েই রইলো। এখন নয়, এখন নয়। যে-বই জীবন্ত, তার উপর জবরদস্তি চলে না। সহজে তাকে পাওয়া যায় না। ক্লান্তি থেকে, বিতৃষ্ণা থেকে, দম্ভ থেকে যদি তাকে হাতে তুলে নাও, সে তোমার হাতে মরে' থাকবে, প্রকাশ করবে না তার রহস্য। অনেক সময় তাকে

দিতে হয়, নিজের অনেকখানি তাকে দিতে হয়। সে সৃষ্টি করবে তার নিজের ভাব-মণ্ডল; আর সেই বাষ্পে জ্বলে' উঠবে তার শিখা। আর তুমিও জ্বলে' উঠবে—নিবিড় মিলনের লাবণ্যে, পারস্পরিক প্রবাহের নিঃস্পন্দ আনন্দে।

কিন্তু তার উপর জোর কোরো না; জোর করলে সে ধরা দেবে না। রাখো নিজের মধ্যে তোমার ক্লান্তি। যে-বই দিয়ে তুমি তাকে হত্যা করতে যাবে, হত্যা করবে সেই বইকেই: ক্লান্তি থাকবে।

অপরূপ, অপরূপ—ভীষণ প্রজ্বলন্ত সেই সব আত্মা। কিন্তু জীবন আরো কত ভীষণ, আরো কত অপরূপ। অনেক, অনেকদিন পর্য্যন্ত, কপিল ভাবলে, আমি সেই আগুনের দেয়ালের মধ্যে আবদ্ধ হ'য়ে ছিলাম। ভেবেছিলাম, সেটাই চরম। দূর থেকে জীবনকে দেখেছিলাম—তার ভাঙাচোরা তার বিকৃতি, তার তুচ্ছতা নিয়ে; আর দেবতাকে আমি ধন্যবাদ জানিয়েছিলাম যে তিনি আমাকে বাঁচিয়েছেন, আমার প্রয়োজন নেই সেই তুচ্ছতায়, সেই ভাঙাচোরায় অবিশ্রান্ত বিক্ষুব্ধ হ'তে —আমার জন্য আছে এই আগুনের দেয়াল, এই বিরাট অখণ্ড জ্যোতিঃপুঞ্জ। আজ ভাঙলো ভুল। আজ জীবন আমাকে মারছে তার অন্ধকার, অপরূপ রহস্য দিয়ে। আজ জীবন আমাকে ছিঁড়ে তুলে নিয়ে যাচ্ছে—তারই তো এই ব্যথা। এতদিন, এতদিন পরে আমি হয়-তো বাঁচতে শিখবো। আমার এই আর্ট তো সেই বাঁচারই একটা অংশ। বাঁচতে হবে, শিখতে হবে বাঁচতে। আমরা যেমন লিখতে শিখি, পড়তে

শিখি, ভালোবাসতে শিখি, তেমনি বাঁচতেও শিখতে হয়। আর এই বাঁচাটাই আসল, সব চেয়ে বড়।

আর এমনি করে' সমস্ত দিন সে কাটিয়ে দিলে; আর বাইরের রাস্তায় সন্ধ্যার ছায়া যখন দীর্ঘ হ'য়ে লুটিয়ে পড়ছে, তখন সে উঠলো, বেরুলো বাড়ি থেকে। আবার গেলো মিনুর কাছে। মিনু কলের নিচে কয়েকটা চায়ের বাসন ধুচ্ছে, আর গান করছে গুন্‌গুন্ করে'। সে চুপ করে' গিয়ে দাঁড়ালো তার পাশে। মিনু একবার চোখ তুলে তার দিকে তাকালো, তার চাপা গলার গুন্‌গুনানি থামলো না।

কপিল বললে, 'আবার আমি এলুম।'

'একটু দাঁড়াও।'

কাজ শেষ করে' মিনু উঠলো। দোতলায় খোলা বারান্দা, সেখানে পাটির উপর বসলো দু'জনে। হাওয়া বইছে দক্ষিণ থেকে; আর পশ্চিমের আকাশে অপরূপ কোনো মণির মত জ্বলছে পঞ্চমীর চাঁদ। খানিকক্ষণ কেউ কিছু বললে না।

মিনু তার নখ দিয়ে পাটির উপর একটা আঁচড় কাটলে। বললে, 'কী চাও তুমি আমার কাছে?'

কপিল বললে, 'বড় একা লাগে।'

'ভালোই তো।'

'না, ভালো নয়। বড় কষ্ট।'

মিনু একটু চুপ করে' রইলো।

'না-হয় কষ্টই হ'লো।'

'যদি কষ্ট হ'তেই হয় তবে আর উপায় কী। কিন্তু কষ্ট পেতে কে চায়? মরতে চায় কে?'

'তোমার মনের কথাটা কী, বলবে বুঝিয়ে?'

'বোঝাতে পারবো না। তুমিই বলো: যা চাই তা কি পাবো না কখনো?'

'সে-কথা আমি বলবো কী করে'? অনেক সময় তো আছে।'

'সময়ই যে নেই। বড় ছোট জীবন।'

'তুমি কি তাকে খুব বেশি করে' চাও, সত্যি?'

কপিল একটু চুপ করে' রইলো, তার মাথা আনত।

'আমি তাকেই শুধু চেয়েছি। মরে' গেলেও মেকিকে মেনে নিতে পারিনি।'

'মেকিকে কেন নেবে?'

'আর যদি তা কখনো না-ই পাই—'

'তবে?'

'কী আর করবো,' ক্ষীণ, অস্পষ্টস্বরে কপিল বললে।

কিন্তু পরের মুহূর্ত্তেই সে চোখ তুলে তাকালো :

'কিন্তু পাই যদি, সেটাই তো ভালো।'

মিনু একটু ভাবলে।

'হয়-তো পাবে—কোনো সময়ে।'

'তোমার মুখের এই আশ্বাস কি নিতে পারি?'

'আশ্বাস যদি দিতে পারতুম, নিজেকেও তাহ'লে দিতে পারতুম।'

'কোথায় তোমার কুণ্ঠা ?'

মিন্থু চুপ করে' একটু ভাবলে।

'তুমি বরং এখন যাও।'

'কিন্তু আবার তো আসতে হবে ফিরে।'

'হ্যাঁ, ফিরে আসবে।'

কপিল মিন্থুর একখানা হাত টেনে নিলে নিজের হাতের মধ্যে। মিন্থু হাত সরিয়ে নিলে না ; নরম, উষ্ণ, ঈষৎ-আর্দ্র তার হাত কপিলের মুঠোর মধ্যে এসে লুকোলো।

'এত ভয় কেন তোমার ?' কপিল বললে।

'না, ভয় নয়। ভয় করিনে বলে'ই তো তোমাকে চলে' যেতে বলতে পারছি।'

'কিন্তু আর কী ? আর কী হ'লে ভরে' উঠবে তোমার মন ?'

'আমাকে দিয়ে তো শুধু কথা নয়।'

'কী, তাহ'লে ?'

মিন্থু ক্ষীণ হাসলো :

'তুমি আর আমি—আমরা কী ? কী আমরা করতে পারি ? সবই ঈশ্বরের হাতে। কেবল ঈশ্বর ফুল ফোটাতে পারেন।'

কপিল একটু চুপ করে' রইলো।

'আমরা নষ্ট তো করতে পারি।'

মিন্থু অত্যন্ত মৃদুস্বরে বললে, 'নষ্ট হবে না।'

তারপর খানিকক্ষণ দু'জনেই চুপ। ক্ষীণ চাঁদ এরই মধ্যে ঝুলে পড়েছে লাল হ'য়ে ; অন্ধকার হ'য়ে আসছে। কপিল মিন্থুর হাত ছেড়ে দিয়ে বললে, 'যাই তাহ'লে।'

'একটু বোসো।'

কপিল চুপ করে' অপেক্ষা করতে লাগলো।

'আমাকে দিয়ে কি ভরবে তোমার নিঃসঙ্গতা?' মিনু আস্তে-আস্তে বললে।

'যদি ভরে' তুলতে না-পারি, সে-দোষ আমারই হবে।'

তারপর অনেকক্ষণ তারা বসে' রইলো, পরস্পরের দিকে না-তাকিয়ে, কিছু না-বলে'। তারপর কপিল আস্তে-আস্তে উঠে দাঁড়ালো।

মিনু তার দিকে চোখ তুললো:

'চললে?'

হ্যাঁ, যাই এবার।'

মিনু তার সঙ্গে সিঁড়ির মাথা পর্য্যন্ত এলো। একটু দাঁড়ালো দু'জনে, একবার মিললো দু'জনের চোখ।

'আবার কবে আসবে?' মিনু বললে।

'আবার দেখা হবে', বলে' কপিল সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলো।

৩

এখন অবিশ্যি বাড়ি ফেরা যায় না, রাস্তায় বেরিয়ে সে ভাবলে। কিন্তু কী করা যায়? কোথায় যাওয়া যায়? যানের আর মানুষের, গতির আর শব্দের সেই ঘূর্ণির মধ্যে সে দাঁড়িয়ে রইলো, ভাবতে লাগলো। সমস্ত রাস্তাটা ঝক্‌ঝক্‌ করছে, বসন্তের এই সন্ধ্যায়। কোনোখানে তাকে যেতেই হবে।

আর হঠাৎ তার মনে পড়লো তার বন্ধু বাসবকে। বাসব দাস, যে গল্প লেখে। তার গল্প ভালো : কিন্তু একজনের লেখার ভিতর দিয়ে তার কতটুকুই বা পাওয়া যায়। অন্তত, এই বাসবকে বেশি পাওয়া যায় না। সে কম লেখে; আর যেটুকু লেখে, খুব কম করে' লেখে। আর তার লেখা যেন তার অন্য-কোনো লুকোনো সত্তা থেকে সঞ্জাত, যা সংযত, যা শীত-স্বভাব, যাতে নিখুঁত মাত্রা। সে-সত্তা নয়, কপিল যাকে চেনে; যা দিয়ে সে হাসে, আর চলে, আর কথা বলে; যেখানে সে জ্বলছে, যেখানে সে যন্ত্রণায় ছিঁড়ে যাচ্ছে, যেখানে তার আনন্দ ফোয়ারার মত উচ্ছলিত। যারা কেবল তার লেখা পড়ে' মুগ্ধ হ'লো, তারা তার কী জানলো?

আমার কপাল ভালো, কপিল ভাবলে, আমি তার সঙ্গে এক সময়ে জন্মেছি। আমার কপাল ভালো, তার সঙ্গে আমার দেখা

হয়েছে। আমি পেয়েছি তার উষ্ণতার স্পর্শ: তার যে-উষ্ণ, উৎসুক প্রাণ জ্বলে' ওঠে তার চোখে আর তার হাসিতে।

দু'জনের মধ্যে ছিলো বন্ধুতা, যার ভিত্তি শ্রদ্ধায়, স্রষ্টার আনন্দে, একই কোনো সন্ধানের ব্যথায়, একই আত্ম-প্রকাশের উৎসুকতায়। আমরা সকলেই চাই অন্য কারো কাছে নিজের কথা বলতে। কিন্তু কথা আসে না। কথা যা আসে, তা রূপক; কেমন করে' লোকে তা বুঝবে? কিন্তু কেউ হয়-তো বুঝবে, কোনো-একজন হয়-তো বুঝবে। তা-ই আমরা আশা করি। একদিন তাকে হয়-তো পাওয়াও যায়। আর তখন মন ভরে' যায় নতুন আনন্দে, নতুন ঐশ্বর্য্যের অনুভূতিতে।

বেশি দেখা তাদের হ'তো না। বেশি দেখা হবার প্রয়োজন যেন তাদের নেই। বাসব ঘুরতো সমাজের অন্য-এক স্তরে। তার অবস্থা ভালো; কপিলের চাইতে সে উঁচু 'জাত'। যে-সব জায়গা, যে-সব বাড়ি নিয়ে বাসবের পরিধি, কপিলের সেখানে প্রবেশ নেই। মাঝে-মাঝে তাদের দেখা হ'তো—দু'জনের কোনো-একজনের বাড়িতে। বাসব হয়-তো তাকে নিয়ে যেতো কোনো হোটেলে। আর তারা কথা বলতো—কি, আরো ভালো, চুপ করে' বসে' থাকতো কোনো ফরাসি সাদা মদের ছোট্ট গেলাস সামনে নিয়ে।

আর তাদের মধ্যে একটা সংস্পর্শ; একটা সংস্পর্শ যা, তারা অনুভব করতো, কখনো নষ্ট হবে না।

অনেকদিন তার সঙ্গে দেখা নেই, কপিল ভাবলে। এখন কি তাকে বাড়ি পাওয়া যাবে? না-পাওয়ারই কথা: তবু—না-

হয় বসে'ই থাকবো গিয়ে। নির্দ্দিষ্ট কারো জন্য অপেক্ষা করা তবু ভালো।

কপিল একটা বাস্-এ চড়ে' বসলো—বাসবের বাড়ি সহরের অন্য প্রান্তে। আর গিয়ে অবিশ্যি সে তাকে পেলো না; অপেক্ষা করতে লাগলো তার ঘরে বসে'।

ঘরের মধ্যে অবিশ্বাস্য বিশৃঙ্খলা। যেখানে-সেখানে বই ছড়ানো—চেয়ারের উপর, মেঝেতে, কুশানের নিচে। কোনো বইয়ের ফাঁকে রয়েছে চ্যাপ্টা-হ'য়ে-যাওয়া সিগ্রেট, পৃষ্ঠা-চিহ্ন। প্রকাণ্ড টেবিল : সেখানে কাগজ-পত্রের অরণ্যের মধ্যে কপিলের চোখে পড়লো একতাড়া আলগা কাগজ—বাসবের অত্যন্ত যত্নহীন দ্রুত হাতের লেখায় ভরা, তুলে নিয়ে সে পড়তে আরম্ভ করলো। সে যা ভেবেছিলো তা নয়; একটা লেখা নয়। চার-পাঁচটা লেখার আরম্ভ: কোনোটার দু'পাতা, কোনোটার কয়েক লাইন মাত্র। গল্প রয়েছে একটা, রয়েছে কেঁচো আর উঁইপোকা নিয়ে প্রবন্ধ, আর শিশুদের জন্য একটা রূপকথা, তারপর আরো একটা গল্প। সবগুলো লেখাই টাটকা —দেখেই বোঝা যায়। কপিল কাগজের তাড়াটা গুছিয়ে একধারে রেখে দিলে সরিয়ে। তার সঙ্গে দেখা হ'তেই বাসব এ-সম্বন্ধে যা বলবে তা মনে করে' মনে-মনে সে হাসলো।

অনেকক্ষণ কাটলো, বাসব ফিরছে না। কপিল বসে' রইলো, দুটো-একটা বই নিয়ে নাড়াচাড়া করলো। এখনো তার মন যাচ্ছে না পড়ায়। একদিন সে গর্ব্ব করে' বলেছিলো, যে-কোনো ছাপার অক্ষরের জিনিস হ'লেই আমি সময় কাটাতে পারি।

আর এখন চারদিকে তার ছাপার অক্ষরের পাহাড়। কিন্তু সে রয়েছে দূরে। অনেক লোভনীয় সব নাম তার চোখে পড়লো : কিন্তু সে পাতাও ও-টালে না, কি পাতা উল্টিয়েই রেখে দিলে।

দশটা প্রায় বাজলো। দু' ঘণ্টার উপরে সে বসে' আছে। কিন্তু তার খুব খারাপ লাগছিলো না। আর বাড়ি ফেরবার কথা এখনো সে ভাবতে পারছে না।

বাসব ফিরলো প্রায় এগারোটায়। সুন্দর তার কাপড়-চোপড়, সুন্দর করে' আঁচড়ানো তার চুল। কিন্তু তার মুখ একটু ম্লান।

'এ কী! তুমি!'

'কত দেরি করলে!'

'কতক্ষণ বসে' আছো?'

'অনেকক্ষণ।'

বাসব একটা চেয়ার টেনে এনে কপিলের কাছে বসলো।—'ঘরটার আনাচে-কানাচে আমি ছড়ানো রয়েছি। কিছু মনে কোরো না।'

'তোমার সব নতুন লেখা দেখছিলুম', কপিল বললে।

'ওঃ!' বাসব দু'আঙুলে মাথাটা টিপে ধরলো। 'কিচ্ছু লিখতে পারছিনে। মাথা খারাপ হ'য়ে গেলো কিনা ভাবছি।

কপিল—এ-কথা শোনবার জন্য সে প্রস্তুত হ'য়েই ছিলো—ক্ষীণ একটু হাসলো।

'সত্যি কিছু লেখা হচ্ছে না। কী হ'লো আমার?'

'কয়েকদিন না-ই লিখলে।'

'আমিও ভেবেছি ও-কথা। মনে-মনে বলেছি, ভিতর থেকে একদিন ঝোঁক আসবে। কিন্তু কতদিন তো গেলো। কোথায়? কোথায়? ভিতরটা যেন একেবারে মরে' গেছে।'

কপিল তার দিকে তাকালো, আশ্চর্য্য উজ্জ্বল তার চোখের দিকে, যেখানে আগুনের মত জ্বলছে প্রাণ। কিছু বললে না।

'তারপর কাল মনে করলুম—আর নয়, এবার লিখবোই, জোর করে'ই লিখবো। কাল সমস্ত দিন ঘরের দরজা বন্ধ করে'—ঐ তো দেখলে। কিন্তু কী কষ্টই যে হয়েছে।'

'একসঙ্গে ক'টা লিখবে?'

'ঐ জন্যেই তো। একটা আরম্ভ করে'ই মনে হয়, কী ছাই হচ্ছে। তক্ষুনি অন্য কিছু ধরি। এমনি করতে-করতে ঐ তো দাঁড়িয়েছে। —পড়েছো নাকি?' একটু থেমে, অন্যরকম স্বরে বাসব জিজ্ঞেস করলে।

'সব পড়িনি।'

'যেটুকু পড়েছো, খুব খারাপ হয়নি তো?'

'না, খারাপ হয়নি।'

কথাটা শুনে বাসব যেন গভীর শান্তি পেলো মনে। নিঃশ্বাস ছেড়ে বললে, 'যাক্, খারাপ না-হ'লেই হ'লো। কিন্তু সত্যি, আর কি কখনো সত্যিকারে ঝোঁক আসবে না লেখার?'

কপিল চুপ করে' রইলো।

'তারপর দ্যাখো—আজকে আবার মনটা এবোরে বেঁকে

বসেছে। কালকের লেখবার ঠেলায় আজ সমস্তটা দিন নষ্ট করতে হ'লো। এই তো, ছাখো, বাড়ি ফিরছি।'

'নষ্ট কেন বলছো?'

বাসব মুহূর্ত্তের জন্য চোখ বুজলো:

'শুধু দিন নষ্ট হ'লে ভাবনা ছিলো না। এখন ভয় হচ্ছে আমি নিজেই হয়-তো নষ্ট হ'য়ে যাচ্ছি।'

'তোমার মন আজ ভালো নেই।'

'অবিশ্যি ও-কথার কোনো অর্থ হয় না, তা ঠিক। কিন্তু আমার আর ভালো লাগছে না এ-সব। বড় বেশি লোক, বড় বেশি কথা—সবই বড় বেশি। আজ এক বাড়িতে গিয়েছিলুম, সেখানে মেয়ে-পুরুষে মিলিয়ে প্রায় তিরিশ জন উপস্থিত ছিলো। আর—বিশ্বাস করবে?—আমি তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে আলাদাভাবে আলাপ করেছি।'

'এতে আশ্চর্য্য কী। তোমার তো এই করে'ই অভ্যেস।'

'কিন্তু এ-অভ্যেস আমায় ছাড়তেই হবে। এই অভ্যেসই আমাকে মেরে ফেলছে। এমন কেন হ'লো যে আগেকার মত আমার আর লেখা আসছে না? এই ধরণের অকারণ, অর্থহীন, নিষ্ফল মেলামেশা—তা আমার জীবনীশক্তি শুষে নিচ্ছে।'

'কিন্তু এরই মধ্যে তুমি জন্মেছো। এরই মধ্যে তুমি বড় হয়েছো। এ থেকে তুমি পালাবে কী করে'?'

'ঘরের দরজা বন্ধ করে' বসে'-বসে' কেবল পড়বো আর লিখবো।'

কপিল মুচকি হাসলো।

'পারবো না ভাবছো?' বাসব সে-হাসি লক্ষ্য করে' বলে' উঠলো। 'ইচ্ছে করলে কী না পারি।'

'হ্যাঁ', কপিল বললে। 'যা ইচ্ছে করে, তা-ই আমরা করতে পারি। যা ইচ্ছে করে, তা-ই শুধু করতে পারি। কিন্তু আমাদের ইচ্ছেটাই যে বার-বার বদলায়।'

'সে-কথা ঠিক।' বাসব একটু চুপ করে' রইলো, তারপর আবার বললে, 'কিন্তু জীবনের একটা কেন্দ্র দরকার?'

'তুমি কি এখনো তা খুঁজে পাওনি?'

'খুঁজে কি তা পাওয়া যায়? নিজে থেকেই তো তা গড়ে' ওঠে, আমরা টেরও পাইনে।'

দু'জনে পরস্পরের চোখের দিকে একবার তাকালো, তারপর খানিকক্ষণ চুপ করে' রইলো।

'তোমার মধ্যে আজ একটা অস্থিরতা লক্ষ্য করছি', কপিল বললে।

'নিজের এই নিষ্ফলতা আমি আর সইতে পারছিনে।'

'লিখতে না-পারার নিষ্ফলতা?' কপিল হাসলো।

'শুধু তা-ই নয়। যদিও সেটাও আছে। একটা প্রকাণ্ড, সমগ্র নিষ্ফলতার সেটা একটা অংশ।' বাসব তার চেয়ারে নড়ে'-চড়ে' একটু ভালো হ'য়ে বসলো। একটু পরে বললে, 'এক-এক সময় আমার মনে হয় যে আমি হয়-তো সত্যিকারের আর্টিস্টই নই। তা যদি হ'তাম, তাহ'লে আমার জীবন আর্টের মধ্যেই পেতো তার কেন্দ্র।'

'ও-কথা বোলো না', প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে কপিল বলে' উঠলো।

কী ছিলো তার কথার সুরে, বাসব একটু অবাক হ'য়ে তার মুখের দিকে তাকালো। কপিল আবার বললে, 'না— ওখানে নয়, ওখানে নয়, তুমি যা চাও। তোমার আর্ট তোমার ভিতর থেকে উঠে আসবে, তোমাকে লুকিয়ে রাখবে না। তোমার আর্ট তোমার ফুটে-ওঠা, গাছের যেমন ফুল। কিন্তু আসল জীবনটা গাছের, আসল জীবনটা তোমার।'

'কিন্তু জীবনে যদি কিছু না-থাকে—'

'জীবনে কিছু থাকবে না কেন? এতদিনে তুমি কি এ-ই বুঝলে?'

একটু সময়, বাসব সোজা তার সামনে তাকিয়ে রইলো।

'এটা বুঝেছি যে জীবনে ক্লান্তি আছে। আর কোনোখানে আছে কোনো বিকৃত ভাগ্য। আমরা যা করতে চাইনে, আমাদের দিয়ে তা-ই করায়। আমাদের মনকে তৈরি করে একরকম করে', আর জীবনের ঘটনাকে তার বিপরীত। আর এই অবিশ্রান্ত আত্ম-বিরোধে আমরা ক্ষয়ে' যেতে থাকি, শুকিয়ে যেতে থাকি।'

'তুমি তোমার নিজের কথা বলছো।'

'হ্যাঁ, নিজের কথাই তো বলছি। একটু আগে বাড়ি ফিরতে-ফিরতে ঠিক এ-সব কথা ভাবছিলুম। যে-সব জায়গায় যেতে আমি চাইনে, ঠিক সে-সব জায়গাতেই যাই; যাদের সঙ্গে মিশলে আমাকে কেবল ক্লান্ত হ'তে হয়, তাদের সঙ্গেই রোজ মিশি।'

‘কেন করো ও-রকম ?’

‘না-করে’ পারিনে।’

কপিল একটু থেমে রইলো।

‘বুঝতে পারি’, মৃদুস্বরে সে বললে। ‘বড় ভয়ানক নিঃসঙ্গতা এই জীবনে।’

বাসবের উজ্জ্বল চোখ মুহূর্ত্তের জন্য যেন কোমল, অস্পষ্ট হ’য়ে এলো। ‘সেইজন্যেই তো’, আস্তে-আস্তে সে বললে। ‘যদি সেই নিঃসঙ্গতা ভরে’ তুলতে না-ই পারো, তাকে মারবার ব্যবস্থা অন্তত করতেই হবে।’

কপিল অপেক্ষা করতে লাগলো, ভিতরে-ভিতরে তার নিঃশ্বাস রুদ্ধ। এ-ই তো সে ভেবেছে আজ সমস্ত দিন ভরে’—সে, ধৈর্য্যে স্তব্ধ, প্রার্থনায় আনত। আর এর কী বলবার আছে এ নিয়ে—এই চঞ্চল, অশান্ত মানুষ, নিজের মধ্যে যে ছিঁড়ে যাচ্ছে ?

‘হ্যাঁ, তাকে মারতেই হবে’, বাসব আবার বললে, ‘মারতে হবেই। যেমন করে’ পারো। আর-কোনো উপায় নেই তোমার। আর কেমন করে’ তা হবে ? কোনো নেশা—যে-কোনো নেশা। আর এ-রকম নেশা আর কী আছে—মানুষের মুখের, মানুষের কণ্ঠস্বরের, মানুষের গায়ের গন্ধের ? এত বৈচিত্র্য কি তুমি পাবে মদে ? এমন অফুরন্ত বৈচিত্র্য ? আর এমন নির্ম্মম, এমন ভয়ঙ্করও আর-কোনো নেশা নয়। আর-কোনো নেশা কি আছে যা তোমার আত্মাকে পচায় ?’

বাসব অল্প একটু হেসে উঠলো।—'আমরাই হচ্ছি বর্ত্তমান যুগের সন্ন্যাসী, আমরা যারা শিল্পী। আমরাই চাই পৃথিবী থেকে দূরে সরে' যেতে, নিজের জীবনকে সৃষ্টি করতে। কোনো শঙ্করাচার্য্যের, কোনো সেইণ্ট্ ফ্রান্সিসের পৃথিবীর উপর এমন বিতৃষ্ণা ছিলো না—যা আছে আমার—আর তোমার।'

'পৃথিবীর উপর বিতৃষ্ণা আছে নাকি আমাদের ?'

'যখন পৃথিবী মানে এক সন্ধ্যায় তিরিশজন মেয়ে-পুরুষের সঙ্গে আলাদাভাবে আলাপ করা,' একটু হেসে বাসব বললে। 'যখন পৃথিবী মানে টাকা পাওয়া আর টাকা খরচ করা। যখন পৃথিবী মানে তোমার চারদিকে সব পচে'-যাওয়া আত্মার দুর্গন্ধ।'

'সে-পৃথিবীকে তোমার যেটুকু না-দিলেই নয়, তা-ই দেবে। তার বেশি দেবে না। বাকিটা তোমার; বাকি সময় তোমার। তা কি যথেষ্ট নয়? অন্তত তা-ই নিয়ে কি তুমি তোমার জীবনকে সৃষ্টি করতে পারো না ?'

'আমিও ও-কথা ভেবেছি,' একটু চুপ করে' থেকে বাসব বললে। 'মনে-মনে বলেছি কতবার: এই আমি দরজা বন্ধ করলুম পৃথিবীর মুখের উপর; এর পর থেকে আমার নিজের জগত যেখানে আমি রাজা, যেখানে আমি ঈশ্বর। বর্ত্তমান সময়ের এমনি ব্যবস্থা যে একেবারে বিচ্ছিন্ন থাকবার উপায় নেই; পৃথিবীর মোটা-মোটা স্যাঁৎসেঁতে আঙুল মাঝে-মাঝে গায়ে এসে লাগবেই। সেটা সইবো মুখ বুজে। আর তা ছাড়া,

সেটা শুধু আমার চামড়াতেই লাগবে—ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। আমার খোলসে, আমার বাইরের-আমিতে। কিন্তু তা ছাড়া আরো কিছু আছে। তা ছাড়া যেটা আছে সেটাই তো আসল। যেখানে আমি রাজা হ'বো, সেখানে আমি হ'বো ঈশ্বর।'

কপিল মাথা নিচু করে' চুপ করে' রইলো, আর বাসব বলতে লাগলো :

'কিন্তু নেশার হাত থেকে মুক্তি নেই। মানুষের মুখ আমাকে দেখতেই হবে, আমাকে শুনতেই হবে মানুষের কথা। আমাকে পেতেই হবে অনেক মিলিত নিঃশ্বাসের সেই ভারি উত্তাপ। রোজ যখন সন্ধ্যা হয়, আমার মধ্যে একটা প্রবল শারীরিক তৃষ্ণার মত জ্বলে' ওঠে সেই কামনা। আর আমাকে বেরিয়ে পড়তে হয়—এখানে, ওখানে, গৃহহীন প্রেতের মত—লম্পট যেমন গণিকার দরজা থেকে দরজায় ঘুরে বেড়ায়। আমাকে যেতেই হবে—এ-কথার ভয়াবহতা তুমি বুঝতে পারছো?—যেতেই হবে, না-গিয়ে আমার উপায় নেই। আর ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমি কাটিয়ে দিই—আমার কাছে যাদের কোনো অস্তিত্বই নেই, সেই সব লোকের সঙ্গে, আমার কাছে কোনোরকম অর্থ হয় না এমন সব আলাপে। ভালো লাগে না, তবু যেতে হয় : নিজের উপর রাগ হয়, নিজেকে ঘৃণা করতে আরম্ভ করি—তবু যেতে হয়। কেন? কেন এটা? এমন একটা নিঃসঙ্গতা আছে যাকে চাপা দিতেই হবে, যাকে ভুলতেই হবে। নয় তো তুমি বাঁচতে পারবে না।'

কপিল চোখ তুলে তার বন্ধুর দিকে তাকালো। তার চোখ ঝলসাচ্ছে; জল্‌জ্বল্‌ করছে তার সমস্ত মুখ। সুপুরুষ তাকে বলা যায় না; কিন্তু এই উত্তেজনা, আত্ম-প্রকাশের এই রোমাঞ্চ তার মুখে এনে দিয়েছে এক অদ্ভুত আভা যাতে সে প্রায় সুন্দর হ'য়ে উঠেছে।

আর, একটু পরে কপিল আস্তে জিজ্ঞেস করলে, 'তোমার স্ত্রী কেমন আছে?'

সঙ্গে-সঙ্গে বাসবের মুখের চেহারা বদলে গেলো। তার চোখ আত্ম-সচেতন হ'য়ে উঠলো; ঠোঁটে ফুটে উঠলো মার্জ্জিত, সূক্ষ্ম, একটু হাসি।

'ও, মৈত্রেয়ী! ভালো আছে, বেশ ভালোই আছে সে।'

বাসবের বিয়ে হয়েছে প্রায় পাঁচ বছর। তারই সমাজের মেয়ে; দু'পরিবারে অনেকদিনের জানাশোনা। যখন তারা নেহাৎ ছেলেমানুষ তখন থেকেই তাদের বিয়ে একরকম ঠিক হ'য়ে আছে। আর তাদের বিয়ে অল্প বয়েসেই হয়।

মৈত্রেয়ীর সঙ্গে কপিলের দু'একবার দেখা হয়েছে। অপূর্ব্ব দেখতে। প্রথম বছরটা বাসবকে খুবই সুখী মনে হয়েছিলো তাকে পেয়ে। লোকে তা-ই বলে।

কিন্তু তাদের এই বিয়েটা সম্পূর্ণ সামাজিক: তাদের সমাজের, তাদের দলের মধ্যে একটা ঘটনা; তাদের সমাজের একটা শোভা যেন। সবাই খুসি হয়েছিলো; সবাই মুগ্ধ হয়েছিলো তাদের দেখে। 'বাঃ, চমৎকার মানিয়েছে।' এবং অন্যের চোখে এই ভালো-লাগাটাই যেন তাদের বিয়ের

উচ্চতম সফলতা। তা যেন তাদের জীবনের নয়: তা বেড়ে উঠতে পারেনি তাদের সত্তার অন্ধকারে।

কিন্তু বিয়ে নেপথ্যের, বিয়ে অন্ধকারের; বিয়ে কেবল দু'জনের পরস্পর-উৎসুক, পরস্পর-সংবেদিত জীবনের। কেবল মিলন নয়, সংবেদন। পূজার প্রদীপের শিখা যেমন দেবতার অন্ধকার মুখের দিকে উৎসুক। যেমন দেবতার অন্ধকার, ভয়ঙ্কর দৃষ্টি শিখার আরক্ত অভীপ্সার উপর আনত। আত্ম-অঞ্জলিতে আর আত্ম-সমর্পণে, প্রার্থনায় আর করুণায় অনির্ব্বচনীয় সেই সংবেদন।

সে-বিয়ে যখন হয়, তখন আর ভয় থাকে না। সেটা সমস্ত জীবনের: সময়ের সঙ্গে-সঙ্গে তা আনে গভীরতরো, নতুনতরো সংস্পর্শ; বয়েস যত বাড়ে, তা শান্তিতে সোনালি হ'য়ে উঠতে থাকে, সোনালি হেমন্তের মত।

কিন্তু এই বিয়ে, যেটা কেবল সামাজিক, প্রধানত অন্যের খুসির জন্য, যেটা একটা শোভা, গোষ্ঠীগত জীবনের একটা অলঙ্কার—এ-বিয়ে কৃত্রিম, এ-বিয়ে মিথ্যা। যে-জিনিস সম্পূর্ণ বাইরে থেকে চাপানো তার ভার বেশিদিন সয় না। যে-জিনিস নিজের ভিতর থেকে গড়ে' ওঠেনি, দু'দিনেই তার রস শুকিয়ে যায়। তারই আছে ক্ষয়; তা-ই যায় পুরোনো হ'য়ে; তাকেই ছিঁড়ে ফেলে সময়ের আঙুল। আর আমরা আমাদের মূঢ়তা থেকে চমৎকার ছোট-ছোট থিওরি তৈরি করি: বলি, ভালোবাসাই এমনি, জীবনই এমনি: বলি, যতদিন তাকে কাছে না পাও, ততদিনই প্রেমের মহিমা।

তখনই আমাদের মধ্যে আসে পবিত্রতার বিকৃতি, কামুকতার বিকৃতি, ছোট্ট-ফুটফুটে-ফুলের-মত মেয়েকে উপাসনার বিকৃতি।

অবিশ্যি এমন নয় যে বাসব সত্যি-সত্যি অসুখী ছিলো। জীবন চলতো মসৃণগতিতে; কোনোখানে একটা চিড় নেই, একটু খুঁত নেই। কোনো অভাব নেই, কোনো বিরোধ নেই, কোনো সংঘাত নেই। স্বামী-স্ত্রী প্রায়ই একসঙ্গে বেরুতো। একই সব লোককে তারা চেনে; একই সব জায়গায় তাদের যাতায়াত। অনেক তাদের রুচির ও আসক্তির মিল। মৈত্রেয়ীর সঙ্গে কথা বলতে বাসবের ভালো লাগতো। আর অনেক-কিছু নিয়েই সে কথা বলতো—শুধু তার লেখার কথা কখনো নয়। আর মৈত্রেয়ী যদি কখনো ভুল করে' কিছু বলে' ফেলতো, সে থাকতো চুপ করে'। সে যে লেখে সেটা যেন ঈষৎ একটু লজ্জার ব্যাপার, স্ত্রীর কাছে তার এই মনোভাব। সেটা লুকোতে হবে: স্ত্রীর কাছ থেকে সেটা লুকোতে হবে।

এমনি কাটছিলো। তারা সুন্দর একটি ছবি তৈরি করেছিলো—এই পর্য্যন্ত। তারা মানিয়েছিলো—যাতে অন্যেরা দেখতে পারে এবং দেখে খুসি হ'তে পারে। এই পর্য্যন্ত। ভিতরে সব ফাঁকা। মৈত্রেয়ী কখনো আগুনের অঞ্জলির মত জ্বলে' ওঠেনি, লুটিয়ে পড়েনি; আর বাসব কখনো তার ভয়ঙ্কর দেবতার-মুখের করুণ, অপরূপ দৃষ্টি আনত করেনি তার উপর।

মৈত্রেয়ীর মনে অবিশ্যি কোনো ক্ষোভ ছিলো না। থাকবার কথাও নয়। যা আমরা কখনো আকাঙ্ক্ষাই করিনি, যা আছে

বলে'ই আমরা জানিনে, তার অভাব আমরা বুঝবো কী করে'? মৈত্রেয়ী যা চেয়েছিলো, তা-ই সে পেয়েছিলো। তার মনে ছিলো সুখ: তার চিরপরিচিত পারিপার্শ্বিকে শৈশব থেকে অভ্যস্ত তার জীবন পেয়েছে বলে'। তার বিয়েটা যেন খেলা। মেয়েদের বিয়েতে যে-বিচ্ছেদের, দ্বিধা হ'য়ে যাবার, ছিঁড়ে পড়বার যে-ব্যথা, তা তাকে পেতে হয়নি। যেখানে সে ছিলো, সেখানেই সে রয়ে' গিয়েছিলো। যে-বাড়িতে তার জীবন কাটবে তার সঙ্গে অনেক আগে থেকেই সে পরিচিত। যে-মানুষকে নিয়ে তার জীবন কাটবে তাকে সে অনেক আগে থেকেই মনে-মনে মেনে নিয়েছে স্বামী বলে'। তাকে পেতে হয়নি কোনো আকস্মিকতার, কোনো বিচ্ছেদের, কোনো নির্ম্মম রহস্যের ব্যথা। আর সেখানেই সে সুখী।

বাসবের কথা অবিশ্যি আলাদা। তার মধ্যে ছিলো এক অপরিসীম অভাবের চেতনা: কোন্ সূক্ষ্ম, তিক্ত কষ্টে তার বুকের ভিতরটা যেন টন্‌টন্ করছে সব সময়। কিন্তু তার কাছে সে হার মানবে না, মরে' গেলেও। এ নিয়ে যদি বিলাপ করতে হয়, লজ্জায় সে মরে' যাবে। আর, কেউ—যত লোকের সঙ্গে সে মিশতো, যত লোকের সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে আলাপ ক'রতো—কেউ সন্দেহ করতো না তার অন্তরের শূন্যতা। শুধু কপিল জানতো। শুধু কপিল বুঝতো।

এ নিয়ে কখনো তাদের মধ্যে স্পষ্ট কোনো কথা হয়নি অবিশ্যি। তবু, কপিলের পক্ষে বোঝা খুবই সহজ ছিলো। কোনোরকমে স্ত্রীর কথা উঠলেই বাসবের মুখের চেহারা

বদ্‌লে যেতো। নেমে আসতো তার চোখের পাতা, তার ঠোঁটে ফুটে উঠতো সূক্ষ্ম হাসি।

আর তবু, স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে তার মনে কোথায় যেন একটা অনাসক্তি ছিলো। সাধারণ অর্থে প্রেম যদি সে চাইতো, সে তা পেতে পারতো ইচ্ছে করলেই। ছোটখাটো একটা প্রেমের ব্যাপার, একটা ছুটির দিন, আত্মার শনিবারের রাত্রি। চাইলেই সে পেতে পারতো। কিন্তু কোনো মেয়ের সঙ্গেই তার সম্পর্ক ভদ্র নাগরিকতার বাইরে যেতে পারতো না। তারপর কোথায় যেন একটা বাধা, তার নিজেরই ভিতরে একটা পাথরের দেয়াল। এটা লোকে লক্ষ্য করতো, আর পুরুষরা বলাবলি করতো—ও রকম স্ত্রী যার, ইত্যাদি। এমনি আমরা মানুষকে বিচার করি, বাইরে থেকে দেখে।

দীর্ঘ নীরবতা। তারপর হঠাৎ কপিল বললে :

'আমি ভাবছি বিয়ে করবো।'

বাসবের উজ্জ্বল চোখের পরিপূর্ণ দৃষ্টি তার মুখের উপর এসে পড়লো :

'হ্যাঁ, করো। আমার অবাক লেগেছে এতদিন তুমি বিয়ে করোনি।'

'অবাক লেগেছে ? কেন ?'

'যখন থেকে তোমাকে চিনি আমার মনে হয়েছে তোমার মধ্যে কোথায় একটা অসম্পূর্ণতা আছে।'

'কপিলের ভগ্নাংশ !' কপিল হেসে উঠলো, নিজেকে ঠাট্টা করে'।

কিন্তু বাসব সে-হাসিতে যোগ দিলে না :

'তোমার মধ্যে ভালোবাসার অভাব ছিলো।'

'ভালোবাসার ?' খুব নিচু গলায় কপিল পুনরাবৃত্তি করলে।

'তোমার জীবন ছিলো একটা স্থরে বাঁধা,' একটু চুপ করে' থেকে বাসব বললে।

'কী সে-স্থর ?'

'তা তুমিই ভালো জানো। কিন্তু একটা স্থর। অনেকদিন চলেছে সেটাতে। সেটারও প্রয়োজন ছিলো—সেটা না-হ'লেও তোমার চলতো না।'

বাসব হঠাৎ থেমে গেলো। কপিল বললে :

'কিন্তু এখন আর সেটাতে চলছে না—এ-ই তো বলতে চাও তুমি ?'

'না, আর চলছে না। সেটা ফুরিয়ে গেছে—অন্তত, যাওয়া উচিত। এখন নতুন স্থর আসা দরকার তোমার জীবনে। আর তা তুমি কোথায় পাবে—তা তুমি কোথায় পাবে, যদি না কোনো মেয়ের মধ্যে পাও, কোনো মেয়ের সঙ্গে সংস্পর্শে ?'

কপিল চুপ করে' রইলো। আর বাসব বলতে লাগলো :

'তোমার মধ্যে বাইরের একটা প্রশান্তি ছিলো। আর আমি, অস্থিরতা যার জন্ম-গত, আমি প্রথমটায় ঈর্ষা করেছিলুম তোমার সেই প্রশান্তিকে। জীবনকে তুমি একদিক থেকে মেনে নিয়েছিলে ; কোনো দিক থেকে, কোনোখানে, একটা মিল খুঁজে পেয়েছিলে নিজের মধ্যে। সেটা ভালো, নিজেকে অকারণে অবিশ্রান্ত ছড়িয়ে-ছড়িয়ে দেয়ার চাইতে সেটা ভালো।

নিজের অনেকটা বাঁচে তাতে, জমে' ওঠে। কিন্তু জীবনের সবটা তুমি নাওনি—নিতে চাওনি। তোমার সেই আত্মস্থতার খুঁটি ছিলো তোমার গর্ব্ব আর নিজের উপরে তোমার অভিমান। অভিমানে তুমি মুখ ফিরিয়ে ছিলে। গর্ব্বে তুমি চোখ তুলে তাকাবে না। নিজেকে তুমি সম্মোহিত করে' রেখেছিলে বিশেষ একটা আদর্শে। খানিকটা জোর-খাটিয়েছিলে নিজের উপর। তোমার মধ্যে যে-প্রশান্তিটা দেখা যেতো, সেটা সত্যিকারের প্রশান্তি নয়: সেটা তোমার গর্ব্বের আর অভিমানের শক্ত-হ'য়ে-থাকা। তোমার মধ্যে কোথায় একটা কঠিনতা কি ছিলো না? সেটা আসে ভালোবাসার অভাব থেকে। আমি অনেকদিন থেকে আশা করে' ছিলুম যে সেটা তোমার ভাঙবে, তোমার এই অভিমানের বিমুখতা। অন্যকে তুমি মারতে চেয়েছিলে তা দিয়ে, মেরেছিলে কেবল নিজেকেই। এ চলতে পারে না, আমি বুঝেছিলুম। নতুন কোনো স্থর আসতেই হবে তোমার জীবনে। তোমাকে সহজ হ'তেই হবে, সত্যিকারের নম্রতায় আর বিনয়ে সহজ। আর তা শুধু তখনই হবে যখন তুমি ভালোবাসার স্পর্শ পেয়েছো। একবার যদি ভালোবাসার হাত তোমাকে স্পর্শ করে, তুমি আর কঠিন হ'য়ে থাকতে পারো না। তুমি তখন মাথা নিচু করবে, তুমি তখন চুপ করে' থাকবে; জীবনের গভীর রহস্যের সামনে স্তম্ভিত হ'য়ে দাঁড়াবে। একটা সময় আছে, যখন আমরা নিজের ব্যক্তিত্বের মোহে অন্ধ হ'য়ে থাকি; তার বাইরে কিছু দেখতে পাইনে; তার বাইরে যা-কিছু, তাকেই ঘা দিতে

চাই। কিন্তু তখন তোমার হবে সেই ব্যক্তিত্ব থেকে মুক্তি। তখন তুমি আর ঘা দিতে চাইবে না ; তখন তোমার মধ্যে আসবে ভালোবাসা ; তখন তুমি বুঝবে।'

'আর এটা কী, এই ভালোবাসা, তুমি যার কথা বলছো ?'

'কী আবার। ভালোবাসা : সহজ, সজীব মানুষের ভালোবাসা। জানো না, কী ?' তারপর হঠাৎ বাসব জিজ্ঞেস করলে :

'কাকে তুমি বিয়ে করছো ?'

'তুমি চিনবে না তাকে।'

'ঠিক করে' ফেলেছো ?'

'আমার মন আছে ঠিক। তার কথা এখনো পাইনি।'

বাসব মুহূর্ত্তকাল কপিলের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো :

'তোমার মুখে নতুন একটা আভা।'

'তুমি তা-ই কল্পনা করছো।'

'না, সত্যি, সত্যি।'

'কিন্তু তোমাকে বলতে পারি এটা ভালোবাসার ব্যাপার নয়।'

'কী করে' জানো ?'

'তার সঙ্গে আমার আলাপ—খুব বেশি নয়।'

'আলাপ দিয়ে কি ভালোবাসা হয় ?'

কপিল চুপ করে' রইলো।

'তুমি কি তাকে চাও ?' বাসব হঠাৎ জিজ্ঞেস করলে।

'চাই ?' কপিল প্রথমটায় ঠিক বুঝতে পারলে না।

'তুমি কি তাকে চাও?' বাসব আবার বললে।

এইবার, তার গলার স্বরে, অর্থটা বোঝা গেলো।

'হ্যাঁ, তাকে আমি চাই,' অত্যন্ত সহজভাবে কপিল বললে।

'এ নিয়ে তুমি খুব বেশি ভাবছো না তো?'

'না, ভাববার এতে কী আছে?'

'লোকে অদ্ভুত সব কথা বলবে। বলবে, বিয়ে করা মস্ত দায়িত্ব। আমরা যে বাঁচি সেটা কি একটা দায়িত্ব? বলো, সেটা কি একটা দায়িত্ব?'

কপিল নীরবে তার বন্ধুর দিকে তাকালো। বাসবের মুখে কয়েকটা রেখা, যেন এ-সব বলতে তার কষ্ট হচ্ছে। তবু, তাকে বলতেই হবে। কী যেন ঠেলে' উঠছে তার ভিতর থেকে।

'বলো, এই যে তুমি আর আমি এখানে বসে' কথা বলছি, এটা কি দায়িত্ব? পরস্পরে আমাদের যে-প্রয়োজন, তা কি দায়িত্ব? ভালোবাসা কি জড়ো করে' রাখবার, জমিয়ে তোলবার, ভারের মত সঙ্গে-সঙ্গে বয়ে' নিয়ে যাবার? লোকে বলবে, বিয়ে তো শুধু ভালোবাসা নয়। বিয়ে তবে কী? মানুষের সঙ্গে মানুষের সংস্পর্শ তা ছাড়া আর কী? লোকে বলবে, ভালোবাসা থাকে না। কিন্তু ভালোবাসা কি নষ্ট হ'তে পারে? তুমিই বলো, ভালোবাসা কি কখনো নষ্ট হ'তে পারে?'

বাসব আস্তে-আস্তে কথা বলছে, নরম স্বরে, নিজের মনে-মনে যেন। হঠাৎ ফুটে উঠেছে তার মুখে সমস্ত দীর্ঘ দিনের ক্লান্তি। তার মাথার এক পাশ থেকে শিথিল চুলের

গুচ্ছ নেমে এসেছে কপালের উপর। সাধারণত উজ্জ্বল, রক্তাভ তার মুখে যেন বেরিয়ে এসেছে অত্যন্ত সঙ্গোপন, অত্যন্ত সযত্নে লুকোনো একটা ম্লানতা।

'লোকে তোমাকে ভালোবাসা সম্বন্ধে সাবধান করে' দিতে আসবে। বলবে, হৃদয়কে বিশ্বাস কোরো না। হৃদয়কে বিশ্বাস করবো না, আমার রক্তের স্পন্দনকে বিশ্বাস করবো না, আর বিশ্বাস করবো তোমাদের কথা! তাদের মনে কেবল ভয়, বুঝি ভুল করলুম, বুঝি এ থাকবে না। তারা সব ক'টা আঙুল দিয়ে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে' রাখতে চায়; আর তবু যখন আঙুলের ফাঁক দিয়ে খসে' পড়ে, দোষ দেয় ভালোবাসার। বলে, ভালোবাসা একটা বিলাসিতা; অনেক আড়ালে, অনে˜ যত্নে রাখতে পারলে তবে তা বাঁচে, অত সময় আমাদের কই? কিন্তু ভালোবাসা কি হীরের একটা টুকরো যে তাকে অনেক যত্নে আড়াল করে' রাখবে? তা একটা স্রোত, জীবনের সঙ্গে তা মিশে যায়। আদরে আর বিরোধে, তিক্ততায় আর আনন্দে তা বয়ে' চলে, তা বয়ে' চলে; জীবনের ঢেউ তাকে ঠেলে নিয়ে যায়; সংঘর্ষে তা নতুন হ'য়ে ওঠে; বছরের পর বছরের বাঁচার ভিতর দিয়ে নিজেকে সম্পূর্ণ করে' তোলে। তা আলাদা করে' রাখবার, আড়ালে লুকিয়ে রাখবার জিনিস নয়: তাকে অর্জ্জন করতে হবে এই জীবনে, যেখানে ক্লান্তি, যেখানে গ্লানি, যেখানে উৎসবের মধুরতা। সেখানেই মিথ্যা, যেখানে আমরা তাকে 'পবিত্র' বলে' জানি; কেবল উৎসবের, কেবল সৌগন্ধ্যের। সব সময় মনে থাকে ভয়, বুঝি একটু

মলিনতা লাগলো তার গায়ে। দারিদ্র্যের সঙ্গে, কোনোরকম কুশ্রীতার সঙ্গে, কোনো বেসুরের সঙ্গে তাকে দেখতে পারিনে। এই বুঝি গেলো! এই বুঝি গেলো! একে আমরা বলি ভালোবাসার দায়িত্ব—আমরা যারা উন্নত, যারা মার্জ্জিত, সূক্ষ্ম হৃদয়বৃত্তিসম্পন্ন। আর সঙ্গে-সঙ্গে অবিশ্যি ভালোবাসা মরে' যায়। কী করে' তা বাঁচতে পারে যদি তা না হয় স্রোত: যদি জীবনের ঢেউয়ের পর ঢেউয়ে তা বয়ে' না চলে? জীবনের মূল উৎসে যদি তা সঞ্চারিত না-হ'লো, তাহ'লে তা বার-বার নতুন করে' নিজেকে সৃষ্টি করবে কোন্ শক্তিতে? যারা বলে ভালোবাসা থাকে না, তারা জানে না এই রহস্য। ভালোবাসা থাকে, হয়-তো তার বাইরের রূপ বদ্‌লায়। আর বয়েস যত বাড়তে থাকে, আমরা পরস্পরের মধ্যে পাই উষ্ণতা, পাই স্নেহ, পাই শান্তি। অনেক বিক্ষোভ, অনেক সংগ্রামের পরই তা আসে, স্নেহের সেই শান্তি। সেটা প্রয়োজন; আর সেইজন্য সেই বিক্ষোভ আর সংগ্রামও প্রয়োজন। ভালোবাসা বিলাসিতা নয়, সেটা প্রয়োজন, জীবনের প্রয়োজন। যত দিন যাচ্ছে, ততই আমি সেটা উপলব্ধি করছি। এমন ভয়ঙ্কর এই প্রয়োজন কে জানতো!'

বাসব এক হাত দিয়ে ঢাকলে তার মুখ। কয়েক মুহূর্ত্ত নিঃস্পন্দ স্তব্ধতা। তারপর সে সরিয়ে নিলে হাত, উঠে দাঁড়ালো চেয়ার ছেড়ে।

'রাত বাড়ছে,' বাসব বললে।

৪

কী ভয়ানক, রাস্তায় বেরিয়ে কপিল বললে।

বাইরে, রাত্রির রঙিন ভিড়। নগর কথা বলছে, প্রলাপ বকছে। আগাছার মত, ভেসে-চলা সমুদ্রের-লতার মত পুরুষ আর মেয়ে—দাঁড়িয়ে আছে, হেঁটে যাচ্ছে, চীৎকার করছে, হাত-পা নাড়ছে। সমস্ত দিন ওরা কোথায় থাকে —আর রাত বাড়বার সঙ্গে-সঙ্গে কোথা থেকে উঠে আসে, মাটির তলা থেকে যেন। দুঃস্বপ্ন। দুঃস্বপ্নের অবাস্তবতা এদের মুখে। এরা রাত্রির জীব, নগরের রঙিন রাত্রির; নগরের অবাস্তব, উন্মত্ত নিশীথের এরা। ভোরের আলোর সঙ্গে-সঙ্গে এরা মিলিয়ে যায়; আর তবু—শূন্য রাস্তাও যেন এদের আতঙ্ক ভুলতে পারে না।

কী ভয়ানক, কপিল আবার বললে।

তাদের দিকে সে তাকিয়ে রইলো। অন্ধকারের ভিতর দিয়ে অনেক মশাল নিয়ে মিছিল চলে' গেলো, দেয়ালে দীর্ঘ, কালো ছায়া ফেলে'—এরা সেইরকম। সেই অস্পষ্ট, অদ্ভুত ছায়ার মত। দ্রুত এদের গতি, দেয়ালের গায়ে দ্রুত-বিসর্পিত ছায়া। আর যে-আলো এদের মুখে পড়েছে তা ধোঁয়ায় ভরা; থেকে-থেকে অস্থির, পাটল নৃত্যে তা লাফিয়ে উঠছে।

আর তারই ভিতর দিয়ে কপিলের বাস্ চলেছে। এক কোণে বসে' সে চোখ বুজলো। একটা বাড়ির ভিতর থেকে স্ত্রীকণ্ঠের বিহ্বল, বিলোল হাসির শব্দ তার কানে এসে লাগলো। কিন্তু এ-ই তো জীবন। একেবারে কাঁচা, খোসা-ছাড়ানো জীবন। এই বিস্রস্ত, বিশৃঙ্খল মেয়ে আর পুরুষের মিছিল। এই উন্মত্ততা। এই শূন্যতা।

জীবনকে জানতে হয়, লোকে বলে। সমস্ত দিক থেকে জীবনকে জানতে হয়। কিন্তু তা আরম্ভ করবো কোন্‌খান থেকে? নগরের এই রঙিন রাত্রি থেকে কি? আমাকেও কি হ'তে হবে দেয়ালের উপর একটা অস্থির, অদ্ভুত ছায়া? তাহ'লে, আর-কিছু না হোক্, জানবার তৃপ্তি তো পাবো।

কিন্তু সব কি আমরা জানতে পারি? যতটুকু আমরা জানতে পারবো, আমাদের জন্ম-গত স্বভাব কি তার সীমা টেনে দেয় না? তার উপর কোনো হাত নেই আমাদের। আমার মধ্যে যা নেই, আমার বিশ্বে তা নেই। শুধু সেটুকু আমি জানতে পারি, আমার নিজের মধ্যে যা আছে। বাইরে থেকে, জোর করে' যে-জানা, সেটা ভুল, সেটা মিথ্যা। তাতে কেবল নিজের ক্ষয়।

এই রাত্রি আমার নয়, কপিল মনে-মনে বললে, ছায়ায় আর পাটল আলোয় জালি-কাটা এই নগর-রাত্রি। একে আমি কেবল দূর থেকে দেখতে পারি, দেখে সরে' যেতে পারি। এ যদি জীবন হয়, আমার জীবন তা নয়। তার

ভালো লাগলো যে বাস্ এরই মধ্যে রাত্রির কেন্দ্র পার হ'য়ে অপেক্ষাকৃত শান্ত রাস্তায় এসে পড়েছে।

আর তবু—আমরা কী? আমরাও তো দেয়ালের গায়ে অদ্ভুত কালো ছায়া, মশালের আলোয় নাচছি? বাসব—সে কী? শুধু তার পটভূমিকা আলাদা। হয়-তো সেখানকার রঙের বিন্যাস একটু অন্যরকম। কিন্তু একই তো।

সেখানেও তো এই অবাস্তবতা, এই উন্মত্ততা, এই শূন্যতা।

কিন্তু এরা কাঁদে না, এই রাত্রির যারা জীব, এরা কথা বলে না। এরই মধ্যে এরা জন্মেছে, এর বাইরে কিছু এরা জানে না। এরা কাঁদে না, এরা ভাবে না। এরা কেবল দেয়ালের উপর মুহূর্তের ছায়া-চিহ্ন, প্রতি রাত্রে ফুটে ওঠে, প্রতি প্রভাতে মুছে যায়।

তা নয় বাসব। যদি সে হয় দেয়ালের উপর ছায়া, তাহ'লে যে-আলো সেই ছায়া ফেলেছে সেই আলোও সে। এ তো তারই আত্ম-প্রসারণ—তার সেই ছায়ামূর্তি। নিজের কাছ থেকে সে পালাতে চায়, নিজের আলো থেকে। তার আলোর আড়াল থেকে সে দেখছে, তাকে দেখতে হচ্ছে, দেয়ালের উপর তার ছায়া-নাচ। আর কী যন্ত্রণা, নিজের ভিতরে এই দ্বিখণ্ডিত হ'য়ে যাবার কী যন্ত্রণা!

ভালোবাসবার প্রয়োজন। ভালোবাসা পাবার প্রয়োজন। কী অদ্ভুত এই প্রয়োজন, কী নিষ্ঠুর। তা মেটাতেই হবে। অথচ কী করে' তাকে পাওয়া যাবে কেউ জানে না।

কেবল ঈশ্বর পারেন ফুল ফোটাতে। আমরা শুধু চুপ করে' বসে' থাকতে পারি।

আর যদি তা কখনো না-আসে? যদি তাকে পাওয়া না-যায়? তাহ'লে সেই অপরিসীম অভাব নিয়েই বাঁচতে হবে, তবু বাঁচতে হবে। কোনো উপায় নেই, কিছু করবার নেই। সমস্ত বাসনা, সমস্ত উত্তপ্ত উৎসুকতা শূন্যতায় ঝরে' পড়বে, মিলিয়ে যাবে। কী অপচয়, কী ভয়াবহ নিষ্ফলতা।

মিনুর ছোট, উষ্ণ হাতের স্পর্শ তার মনে ফিরে এলো, সেই স্পর্শ যেন এখনো রয়েছে তার হাতে। সেখানে যেন জ্বলছে সদ্যোজাত, স্বাধীন কোনো প্রাণ, যেখানে সে তাকে স্পর্শ করেছিলো। এ-ই কি ভালোবাসা?

কিন্তু এটা ঠিক যে কপিলের জীবনে নতুন স্বর এসেছে। সে জেগে উঠেছে নতুন একটা অনুভূতিতে। এ আমি কখনো জানিনি, মনে-মনে সে বললে। এই অদ্ভুত প্রয়োজন, আর এই ব্যথা! কে জানতো ভালোবাসার এমন অসীম ক্ষমতা আমার মধ্যে রয়েছে। আমি যে এত ভালোবাসতে পারি তা কি আমিই জানতুম!

আর এর পর—ভাগ্য এ নিয়ে কী করবে? সেই সার্থকতা কি আসবে? না কি, আস্তে-আস্তে, অলক্ষিতে, সময়ের সঙ্কীর্ণ আঁকাবাঁকা রাস্তা দিয়ে এ ঝরে' পড়বে শূন্যতায়, নিঃশেষ হ'য়ে যাবে নিষ্ফলতায়?

যদি তা-ই হয়? ওকে যদি হারিয়ে ফেলতে হয়

সময়ের অন্ধকার গলিতে? আর কপিলের হৃৎপিণ্ড হঠাৎ যন্ত্রণায় মুচড়িয়ে উঠলো, সেই কথা ভেবে।

আর মুহূর্ত্তে সে উপলব্ধি করলে বাসবের মনের ভীষণ, বিশাল হতাশা। তার মত এমনি প্রশ্ন সে অনেক হয়-তো করেছে মনে-মনে। আজকাল আর করে না। তবু—এমনি করে' তারও হৃৎপিণ্ড হাঁপায়, ভেঙে পড়তে চায়। কী করে' সইছে সে? কিন্তু সইতেই হবে, সইতেই হবে। আর বাসবের ভিতর থেকে তা ঠেলে ওঠে, মাথা খুঁড়ে মরে—আর ঐ তো সে, অনেক লোকের, অনেক কথার নিঃসাড়তার মধ্যে। সে পেয়েছে তার নেশা, যাতে সে আচ্ছন্ন হ'য়ে থাকতে পারে তখনকার মত। তার এই বাইরের জীবন—তাকে নিজের চারিদিকে বুনে নিয়েছে বর্ম্মের মত। বাঁচতে হবে তো।

কিন্তু সে, কপিল—বাইরের জীবনের এই নেশাও তার নেই। কী আছে তার? তার কি আর্ট? তার কি ঈশ্বর? বজ্রের মত ভয়ঙ্কর বাণী কি তার? সে ভেবে দেখলে। সে ভেবেছিলো তপস্বীর মত কাটবে তার জীবন, নিজের মধ্যে আবদ্ধ। কী মূঢ়তা, কী অন্ধ মূঢ়তা। নিজেকে কেবলই ফেনিয়ে-ফেনিয়ে পৃথিবীকে ভরে' তোলা। বইয়ের মধ্যে নিজেকে পড়া, আকাশের তারায় নিজেকে দেখা, কোনো মেয়ের উৎসুক, সানন্দ স্বরে নিজেকে শোনা। এই তো তোমার তপস্বীর জীবন! সে আরো ভেবে দেখলে। আর তার মনে হ'লো তার জন্য আর-কিছু নেই, আর-কিছু নেই; শুধু আছে মিনুর নরম, উষ্ণ হাত।

সেই রাত্রে বাড়ি ফিরে সে কোনো কাজ নিয়ে বসলো না। বিছানায় শুয়ে তাকিয়ে রইলো অন্ধকারে। ঘুম তার একেবারেই পাচ্ছিলো না; তবু যেন তার ভালোই লাগছিলো স্তব্ধ হ'য়ে শুয়ে থাকতে, অন্ধকারের মধ্যে তাকিয়ে। আর চিরকাল এটা ছিলো তার জীবনের একটা আতঙ্ক—যদি বিছানায় শুয়ে ঘুম না আসে! কিন্তু আজ যেন আর এই অন্ধকারকে তার ভয় নেই, এই নিঃসঙ্গতাকে। কী যেন, এটা ভালো লাগছে। কী ব্যথা, মিনুকে ছেড়ে এই চলে' আসা। তখন সে কিছু টের পায়নি; কিন্তু এখন তার হৃৎপিণ্ড টন্‌টন্‌ করছে টন্‌টন্‌ করছে। আর তবু কেমন যেন তার ভালোও লাগছে—ভালো লাগছে এই রাত্রি, রাত্রিতে মিশে গিয়ে তার এই চুপ করে' শুয়ে থাকা।

পরের দিন তার কাজ ছিলো সহরে। সমস্তটা দুপুর তাকে কাটাতে হ'লো পয়সা করবে বলে' পণ করেছে এমন সব লোকের সঙ্গে পয়সার আলাপে। এ-রকম তাকে করতে হয় মাঝে-মাঝে। তখন সংসারের মোটা মোটা, স্যাঁৎসেঁতে আঙুলগুলো বেশ ভালো করে'ই লাগে তার গায়ে। কিন্তু গায়ে সে মাখে না। সেটা নেহাৎই তার বাইরের খোলস, যেখানে লাগে সংসারের চড়-চাপড়। তার ভিতরটা সব সময় অনুপস্থিত। আর ফেরবার সময়, সে-সমস্ত সে বাইরে রেখে আসে, বাড়ি পর্য্যন্ত বয়ে' নিয়ে আসে না—যদিও তখনকার মত মন হয়-তো খারাপ লেগেছিলো, হয়েছিলো রাগ।

একদিক থেকে, সে বুঝেছিলো, এটাই বাঁচবার উপায়।

এই ভোলবার ক্ষমতা, মনে না-করবার, মনে না-রাখবার ক্ষমতা। পৃথিবীর সমস্ত ছোটখাট আঁচড় আমাদের যেটুকু নেবার তা তো নিচ্ছেই; তার উপরেও যদি তা নিয়ে আমরা ভাবতে যাই, তাহ'লে বাঁচবো কখন?

কিন্তু সেদিন সহরটাকে তার মনে হ'লো যেন অতিকায় কুৎসিত একটা জন্তু; তারে-তারে, চাকায়-চাকায় সে ডাক ছাড়ছে, কাকে তেড়ে মারতে আসছে তৃপ্তিহীন, হিংস্র আক্রোশে, দাঁত দিয়ে তার গড়াচ্ছে ব্যস্ততার ফেনা। মানুষের নিজের হাতের সৃষ্টি, এই বীভৎস জন্তু। মানুষ তাকে দিয়েছে তার নিজের প্রাণের অংশ। মানুষের হাত তৈরি করেছিলো বাগান, তুলেছিলো মন্দির, তার আনন্দ ফুটেছিলো ফুলে, আকাশের দিকে উঠেছিলো তার পাথরের স্তব। কিন্তু তার শেষ কীর্ত্তি তখনো বাকি ছিলো: আধুনিক কালের এই সহর, বাতাস যেখানে ভরে' গেছে যন্ত্রের চীৎকারে, আর ব্যবসার ঘুর্ণিস্রোতে মানুষ কুটোর মত ঘুরপাক খাচ্ছে। মানুষ একে তৈরি করলে নিজের হাতে, তারপর স্তম্ভিত হ'য়ে গেলো নিজেই। ব্যবসার এই বিশাল, জটিল, সর্ব্বব্যাপী চাকা, দারুণ বেগে তা ঘুরছে, অবিশ্রান্ত প্রদক্ষিণ করছে নিজেকে, কী ক'রে' তা চলছে কেউ জানে না, কারো ক্ষমতা নেই তাকে থামাতে পারে। আর আমরা সবাই আটকা পড়েছি তার মধ্যে, সবাই, কেউ বাদ নেই; তারই ঠেলায় তো আমরা ছিটকে পড়ছি এখান থেকে ওখানে; ছটফট করছি, কাৎরাচ্ছি, গোঙাচ্ছি, তার চাপে রক্ত আমাদের শুকিয়ে গেলো। তারই ঠেলায়, কপিল ভাবলে, আমাকে আসতে হয়েছে

এদের কাছে, এই সব লোক, মাকড়শার মত মানুষ, ব্যবসার সেই পরম চাকার মধ্যে ছোট-ছোট এক-একটি চাকা; সেই বিরাট ঘূর্ণনের অংশ, কিন্তু এরাও ঘুরছে নিজেদের চারদিকে, অবিশ্রান্ত। ধূসর মানুষ, কেশহীন, রক্তহীন, তাদের কোনো বয়েস নেই, তাদের সুখ নেই কি দুঃখ; তাদের হলদে চোখে শুধু লোভের ভীষণ একাগ্রতা। যীশুকে দোষ দিয়ে বলেছিলেন কবি: তোমার নিঃশ্বাসে পৃথিবী ধূসর হ'য়ে গেলো কিন্তু সেই কবি যদি দেখতেন আজকের এই ব্যবসা-ধূসর পৃথিবী, যীশুকে ক্ষমা করতে পারতেন তিনি। এদের প্রত্যেক নিঃশ্বাসের সঙ্গে আকাশের রঙ একটু করে' মুছে যাচ্ছে। উচিত নয় এদেরকে নিঃশ্বাস ফেলতে দেয়া। আর তবু, কপিল ভাবলে, এরাই খুব সহজে, নিশ্চিন্ত আরামে নিঃশ্বাস ফেলতে পারছে; আর আমাকেই এসে বসে' থাকতে হচ্ছে এদের কাছে, যাতে নিঃশ্বাস ফেলবার পবিত্র অধিকার থেকে বঞ্চিত হ'তে না হয়। লোভ, লোভ; সেই বিরাট, নিদারুণ চাকাকে যা ঘোরাচ্ছে তা লোভ; এই মানুষদের হলদে, শক্ত দৃষ্টিতে লোভ, লোভ; আর এদের শক্ত একটানা কণ্ঠস্বরে লোভ, লোভ। কপিল তা বরাবর জেনে এসেছে, তবু আজ যেন সে তা নতুন করে' উপলব্ধি করলে। আর তার সমস্ত জঠর যেন নিজেকে উগ্‌রে ফেলতে চাইলো, বিতৃষ্ণায়। কেমন করে', যেন তার নাড়ির সঙ্গে জড়িয়ে গেছে ব্যবসার এই জটিল জালের একটা বিষাক্ত সুতো, তাকে উগ্‌রে ফেলতে হবে।

আর যখন সব কাজ তার শেষ হ'লো, তার মনে হ'লো

সমস্ত শরীরে আর মনে এমন ক্লান্ত জীবকে কখনো তার লাগেনি। পরিষ্কার দিনের আলোয় এই সহরের দিকে সে যেন তাকাতে পারছে না। সূর্য্য আর তত উজ্জ্বল নয়, মানুষের লোভ তার মুখ ঢেকেছে। আমাকে যেতেই হবে, সে ভাবলে, এখান থেকে আমাকে চলে' যেতেই হবে। আমাকে যেতে হবে সূর্য্যের আরো কাছে।

সে ব্যবস্থা করে' ফেললো দু' একদিনের মধ্যেই। তারপর কলকাতা ছেড়ে চলে' এলো সাঁওতাল পরগনার এক ছোট্ট সহরে, যেখানকার মানুষের সব চেয়ে বড় উত্তেজনা এই যে রাত্তিরে রেলের লাইন দিয়ে নীল-আলো-জ্বালা মস্ত ডাকগাড়ি ছুটে যায়। সেখানে সে নিলে ছোট একটা বাড়ি, কিছুদিন থাকবে বলে'। একেবারে একা; একটা লোক শুধু আছে, সে রেঁধে দেয়। বড় ভালো লাগলো তার যে এখানে সকালবেলা উঠেই খবরের কাগজের মুখ দেখতে হয় না।

আর তার মনে নামলো শান্তি। এখানে আকাশ আছে। এখানে আকাশ সমস্ত পৃথিবী ভরে' ছড়িয়ে আছে। এক পা চললেই যেন আকাশের উপর হোঁচট খেয়ে পড়তে হয়। যে-কোনো দিকে তাকালেই আকাশের উপর চোখ গিয়ে পড়ে। আর এত ভালো লাগে, আকাশের দিকে চুপ করে' তাকিয়ে থাকতে এত ভালো লাগে। প্রথম কয়েকদিন, কপিল তা ছাড়া আর কিছুই প্রায় করলে না।

আর আকাশে তার আত্মা ভরে' উঠলো—কোনো দুর্লভ, স্বচ্ছ সুরায় স্ফটিকপাত্র যেমন ভরে' উঠতে পারে। এমন নীল

কতদিন সে দেখেনি। সকালবেলায় ম্লান, নতুন সূর্য্যের জ্যোতিতে অস্পষ্ট। আর দুপুরবেলায়, সূর্য্যের আলো যখন সব দিকে সমান হ'য়ে ছড়িয়ে পড়ে, সমস্ত আকাশ একটা বিশাল, অখণ্ড নীলার মত জ্বলে' ওঠে। বিশ্বাস হয় না, এত নীল। সূর্য্য নামে পশ্চিমে, বিকেলের আকাশ নরম, সমস্ত দিনের পর অলস-হ'য়ে-আসা যেন। লাল সূর্য্য আগুনের একটা নীড় হ'য়ে ওঠে, দিগন্তে ডুবে যায়; আকাশের চোখে যেন ঘোর লাগে। কোথায় একটু লালচে আভা; ক্লান্ত, আহত দিনের রক্তস্রোত অন্ধকারে মিশে যাচ্ছে। তারপর অন্ধকার। বিস্ময়ে কপিলের নিঃশ্বাস আটকে যায়; কী অদ্ভুত সত্যিকারের এই অন্ধকার। যেন হঠাৎ কালো একটা সমুদ্র উথলে উঠলো—দিগন্তকে নিয়ে গেলো ভাসিয়ে। আর সেই অন্ধকার ভরে' সমস্ত আকাশ যেন তারায়-তারায় গান করে' ওঠে।

প্রথম গ্রীষ্ম—দুপুরবেলায় হাওয়া তেতে ওঠে। গাছগুলো তাদের সমস্ত পাতা ঝরিয়ে দিয়েছিলো, এইবার নতুন করে' ভরে' উঠছে। কোনো-কোনো গাছ এখনো নগ্ন, প্রতীক্ষায় স্তব্ধ। হাওয়ায় ওঠে শুকনো, হলদে পাতার ঘূর্ণি; কাঠবিড়ালি খামকা চমকে উঠে ছুটে যায়। লাল রাস্তা দিয়ে যায় গোরুর গাড়ি, নেংটি-পরা ছোট ছেলে চুপ করে' দাঁড়িয়ে তা-ই দেখে।

শুধু এ-ই। এ-ই নিয়ে সমস্ত দিন, সেই আকাশের মাঝখানে। দিগন্তে ঘন-নীল রেখা, সকালবেলায় কান্নার চোখের মত ছলোছলো। পাখিরা চ্যাঁচামেচি করে নতুন আলোয়; আর বিকেলের ছায়া যখন দীর্ঘ হ'য়ে আসে, তাদের ডানা-ঝাপটানির

শব্দে আকাশ ভরে' যায়। গোরুরা তাকিয়ে থাকে ঘুমে-ভরা চোখে। হাওয়ায় শিরশির করে' ওঠে গাছগুলো।

শুধু এ-ই। এ-ই নিয়ে সমস্ত দিন। আর রাত্রি ভরে' অন্ধকার, আর তারা। আর আছে সেই-সব চাঁদের রাত্রি, চাঁদ যখন বুকের উপর এসে লুটিয়ে পড়ে। কখনো সে ক্ষীণ আর বাঁকা, কোনোরকম করে' আকাশকে আঁকড়ে রয়েছে যেন, তবু সে আমাদের রক্তকে টেনে তুলতে চায়। আর আছে জ্যোছনার বন্যার রাত্রি; এত জ্যোছনা, চাঁদ নিজেই হারিয়ে যায় তার মধ্যে। তারপর কৃষ্ণপক্ষ: হঠাৎ মাঝ-রাতে লাল হ'য়ে ভাঙা চাঁদ উঠলো, মাঠের বুকে অদ্ভুত সব ছায়া উঠলো লাফিয়ে। কিন্তু সব সময়, যে-কোনো অবস্থায়, বুকের উপর এসে সে ধাক্কা মারে, রক্তকে টেনে তোলে তার দিকে, যেন জোয়ারের উচ্ছ্বাসে।

এখানে তারা অনেক কাছে—আকাশ, আর আকাশের চাঁদ আর তারা—এখানে তারা জীবন্ত। এখানে তারা দরজায় এসে ভিড় করে। ঘা দেয় বুকে। এখানে তারা সমস্ত জীবনের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে; মিশে যায় রক্তে। এখানে তারা বলে।

কী বলে? কপিল তা বোঝে না, বুঝতে চায়ও না। শুধু তার মনে হয়, কী যেন সে পেয়েছে, এতদিন পরে কী যেন সে ফিরে পেয়েছে। আর এক-এক রাত্রে, যখন তার সাদা বিছানায় জ্যোছনা লুটিয়ে পড়ে, তার চোখ জলে ভরে' ওঠে, সেইদিকে তাকিয়ে।

আর এখানে পৃথিবীতে যে-স্তব্ধতা, তা এলো তার মনেও। সে স্বচ্ছ, স্তব্ধ একটা দিঘির মত হ'য়ে উঠলো, যেখানে আকাশ প্রতিফলিত। এখন পড়বার সময়; কাব্যের রহস্যের আর রোমাঞ্চের। কলকাতা থেকে সে আনালে বই। কখনো সে পড়ে, কখনো সে চুপ করে' বসে' থাকে : কখনো নিজে একটু লেখে; কখনো কলম রেখে দিয়ে বসে'-বসে' ভাবে।

৫

এক সাঁওতাল মেয়ে ইঁদারা থেকে তার স্নানের জল তোলে, বাসন মাজে ; তার দীর্ঘ, সবল বাহুর কালো রঙ্ রোদে চিক্‌চিক্ করে। একদিন সে কপিলের চোখে পড়লো।

বাড়ির সামনে অনেকখানি ফাঁকা জমি ; সেখানে বিকেল-বেলায় সে শুকনো পাতা আর কাঠের কুচি কুড়োচ্ছে, বাড়ি নিয়ে যাবে বলে'। তার পরনের কাপড় কুসুম ফুল দিয়ে হলদে রঙ করা। আঁচল কোমরে জড়ানো। সবগুলো এক জায়গায় সে জড়ো করলে, তারপর আঁচলে তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো।

একটু দূরে কপিল ছিলো দাঁড়িয়ে ; তাকে দেখেই মেয়েটা চোখ নামিয়ে নিলে। . তারপর তার ফুলে'-ওঠা আঁচলটা শক্ত করে' বেঁধে নিয়ে বিকেলের আলোর ভিতর দিয়ে মাঠ পার হ'য়ে চলে' গেলো।

পরের দিনও সে অমনি যখন পাতা কুড়োচ্ছে, কপিল এগিয়ে এলো তার কাছে। মেয়েটা চোখের কোণ থেকে তাকে দেখলে ; তারপর কোমর থেকে আনত তার শরীর সোজা করে' তুলে দাঁড়ালো।

কপিল জিজ্ঞেস করলে, 'রোজ-রোজ পাতা নাও কেন ?

মেয়েটা ভুরু বাঁকিয়ে তার সাঁওতালি বাঙলায় বললে, 'এ-সব পাতা দিয়ে আর কী হবে? তবে তুমি যদি রাগ করো আর নেবো না।'

কপিল মনে-মনে হাসলো। এই সমস্ত পাতা, ঝরে'-পড়া ডালের ছোট্ট কুচিটুকু পর্য্যন্ত তার। সে ভাড়া দেয়। তার অধিকারের মধ্যে সমস্ত। আর এই সাঁওতাল মেয়েও তা জানে।

'এ-সব দিয়ে কী করো?' সে আবার জিজ্ঞেস করলে, তার কণ্ঠস্বরে সাঁওতালি সুর আনবার চেষ্টা করে'।

'আগুন জ্বলে। রান্না হয়।'

মেয়েটা নির্ভীক চোখে কপিলের দিকে তাকালো। তার জট-বাঁধা চুল তেলের অভাবে লালচে। তার মুখের ছাঁদ সুশ্রী নয়; কিন্তু তার দীর্ঘ, দৃঢ় শরীর নিখুঁত আয়নার মত নিটোল।

কপিল জিজ্ঞেস করলে, 'তোমার নাম কী?'

একটু চুপ করে' থেকে মেয়েটা বললে, 'ঝমর।'

'ঝমর?' কপিল ঠিক ধরতে পারলে না প্রথমটায়।

'ঝমর।—পাতা নেবো?' একটু পরে, একটু উদ্বিগ্নস্বরে মেয়েটা জিজ্ঞেস করলে।

'নাও না।'

ঝমর আবার নিচু হ'য়ে কুড়োতে আরম্ভ করলো। তার পিঠের বাঁকা রেখা বিকেলের আকাশের নিচে স্পষ্ট আর তীক্ষ্ণ। কপিল একটু তাকিয়ে রইলো, তারপর আস্তে-আস্তে ঘরে গিয়ে ঢুকলো।

আর-একদিন সকালে সে তাকে দেখলে, মস্ত ধামা মাথায় চাপিয়ে তার স্নানের জল এনে রাখছে। তার দুই দীর্ঘ, কালো হাত উপরের দিকে তোলা, শক্ত আঙুলগুলো ধামার ধার আঁকড়ে রয়েছে। শ্রমের চাপে চোখের দৃষ্টি তার স্থির। কপিল বারান্দায় বসে' ছিলো; সে তার পাশ দিয়ে, তাকে পার হ'য়ে গেলো স্নানের ঘরে, তাকে দেখলেই না যেন। কোমর বাঁকিয়ে সে ধামা নামালে, তারপর স্নানের টবে ছলছলিয়ে ঢাললে জল। দূর থেকে কপিল অস্পষ্ট দেখলে। সে ফিরে এলো, হাতে তার শূন্য ধামাটা ঝোলানো; গেলো বাইরে ইঁদারার ধারে; দড়ি-বাঁধা বালতিতে করে' জল টেনে-টেনে ধামা ভরলো; একটু থমকে দম বন্ধ করে' সেটা তুলে নিলে মাথায়; তারপর আবার গেলো কপিলকে পার হ'য়ে স্নানের ঘরে।

কপিল চুপ করে' তাকিয়ে দেখলে। এই শান্ত, উজ্জ্বল সকালবেলার সঙ্গে এই কালো মেয়ের অঙ্গ-চালনার ভঙ্গির কোথায় একটা মিল ছিলো যেন।

বিধাতা এর শরীরে সুষমা দেননি। যে-সুষমা প্রতি অঙ্গের পারস্পরিক ছন্দে, যে-লাবণ্য মুখের লক্ষ সূক্ষ্ম ভাবনার ঢেউ-খেলানোয়, তা থেকে এ বঞ্চিত। কেননা সেটা মানুষের সৃষ্টি। সেটা মানুষের নিভৃত অবসরের রচনা। একদিন কোনো মেয়ে আয়নায় তার মুখ দেখেছে ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে; একটি অলক খসে' পড়েছে কপালের উপর—তা সরাতে গিয়ে বাহুর এক অপরূপ ভঙ্গি সে আবিষ্কার করেছে।

আর-একদিন কোনো পুরুষ তা দেখে মুগ্ধ হয়েছে : সে-কথা বলেছে তার কানে-কানে। এমনি করে' শরীরের সুষমা আমরা তৈরি করেছি—হাজার দিনের ভিতর দিয়ে, হাজার ভাঙা মুহূর্ত্তে, হাজার আলস্যের স্বপ্নে। সে-সুষমা আছে বন্য পশুতে, কিন্তু যে-মানুষ সভ্যতার দৌড়ে একেবারেই পেছিয়ে আছে তার মধ্যে নেই। অন্তত আমাদের চোখে তা লাগে না।

কিন্তু এই মেয়ের শরীরের সবল, নির্ভীক গতির রেখা—তাতে কী আছে, যা প্রায় সৌন্দর্য্যের মত। যখন সে স্থির হ'য়ে থাকে, তাকে মনে হয় একতাল কাদা, এখনো ঈশ্বরের আঙুল তাকে স্পর্শ করেনি। কিন্তু যখন সে চলে, যখন সে কাজ করে, যখন সে দড়ি টেনে-টেনে ইঁদারা থেকে জল তোলে—তখন তার দেহ-রচনার কুশ্রীতাকে ছাড়িয়ে অন্য-কিছু বেরিয়ে আসে—কাজের মধ্যে সে এমন আত্ম-অচেতন; তার বাহুর, তার আঙুলের, তার সমস্ত অঙ্গের নিঃশব্দ গতি-রেখা এমন স্বতঃস্ফূর্ত্ত স্রোতে ঝরে' পড়ে তার চারদিকে। এ তো প্রায় সৌন্দর্য্য, এই স্তব্ধ সূর্য্যালোকে তার কাজের নিঃশব্দ গতি-রেখা।

কোনো অভিযোগ এর নেই। সহজে এ কাজ করে, সব সময় এ কাজ করে, নদী যেমন তার নিজের জল বয়ে' নিয়ে-নিয়ে যায়। কখনো বলে না, 'উঃ, মরে' গেলুম।' কখনো মনে আনে না, 'আর পারিনে, আর পারিনে।' এ তার রক্তের মধ্যে মিশে গেছে—এই কাজ। যখন অন্যের কাজ শেষ হয়, তখন সে তার নিজের কাজ নিজে তৈরি করে' নেয়। শালের পাতা দিয়ে ঠোঙা

তৈরি করে। আর পুরোনো কাপড়ের পাড় ছিঁড়ে-ছিঁড়ে চুল বাঁধবার দড়ি। কোথা থেকে খুঁজে-খুঁজে কী সব ফুল আর লতা জোগাড় করে' আনে কাপড়ে রঙ করবে বলে'। সব সময় সে কাজ করছে—যদিও সে তা জানে না।

কাজ তো এমনি হওয়া উচিত। কাজকে যখন ভার হ'য়ে উঠতে দিই, তখনই তো আমরা মরি। আর তাই, আমাদের সভ্য জীবন দীর্ঘ একটা চীৎকার হ'য়ে উঠছে : আর পারিনে! আর পারিনে! এতটুকু কাজ আমরা করবো না, একবার প্রতিবাদ না-করে'। আমাদের মেয়েরা সংসারের সব কাজই হয়-তো করে, কিন্তু তাদের মুখ থেকে এ-কথা কখনো মিলোয় না : মরে' গেলুম, আর পারিনে। আর তাই, ও-সব কাজ তাদের অবিশ্যি করা উচিত নয়, কখনো করা উচিত নয়। শূন্যতায়, শূন্যতায় তারা পচে' থাক্, তবু যেন তারা কাজ না করে।

আর আমরা পুরুষরা সমস্ত দিন ভরে' ছুটোছুটি করি, ছটফট করি, প্রতি মুহূর্তে ভাগ্যকে আমরা শাপ দিই, নিজের জীবনকে ছিঁড়ে ফেলতে চাই কুচি-কুচি করে'—আর এমন ক্লান্তি, এমন বিতৃষ্ণা নিয়ে বাড়ি ফিরি যে আর-কিছু তখন আমাদের করবার থাকে না। বাকি সময়টুকু আমরা মৃত। তাই যদি হয় তবে ফেলে' দাও কাজ, দু'হাতে তুলে নিয়ে আছড়ে ভেঙে ফেলো। আর তাতে যদি সভ্যতা থেমে যেতে হয়, মানুষকে লুপ্ত হ'তে হয় পৃথিবী থেকে, তা-ই হোক্ : তাতে কিছু এসে যায় না।

কেননা এটা সত্যি যে প্রত্যেক মানুষেরই কাজ করা উচিত। তা ছাড়া কী আমরা করতে পারি? কিন্তু সে-কাজ

যেন মিশে যায় আমাদের রক্তের মধ্যে ; কাজ যখন করছি তখনও যেন তাকে ভুলে' থাকতে পারি। তা যেন আমাদের নিজেদের বাইরের কিছু না হয়, বাইরে থেকে চাপানো ; তা যেন আমাদের পেয়ে না বসে দানোর মত, চুলে ধরে' আমাদের টেনে নিয়ে না যায় কাজের কুৎসিত উন্মত্ততায়।

সত্যিকারের যেটা কাজ, তার মূল আমাদেরই সত্তায় ; আমাদেরই মধ্যে তা বেড়ে ওঠে গাছের মত, ছড়িয়ে পড়ে উৎসুখ শাখায় আর অজস্র নতুন পাতায় : আর সেই গাছ থেকে বেরিয়ে আসে ফুল, আর ফল, আনন্দে রক্তিম— প্রাণে গুঞ্জিত এই গাছ, আনন্দে আর উৎসাহে মর্ম্মরিত। মানুষ সৃষ্টি করে এই কাজ, এই কাজে সে নতুন হ'য়ে ওঠে। কাজ যদি তা না হয় ; কাজে যদি কেবল টাকাই বাড়ে, ফুল না ফোটে ; যদি তার একমাত্র ফল হয় মোটরগাড়ির সংখ্যাবৃদ্ধি—তাহ'লে পৃথিবীর সমস্ত টাকা আর সমস্ত মোটর-গাড়ি মিলেও আমাদের বাঁচাতে পারবে না।

আর কপিলের ভালো লাগলো এই সাঁওতাল মেয়ের তন্ময় আত্ম-অচেতন কাজ—সে, মানুষে ক্লান্ত, কথায় ক্লান্ত, সহরে ক্লান্ত।

এখানেও তো জীবন, সে ভাবলে। চিৎপুরের রাত্রি জীবনের একমাত্র রূপ নয়। বাসবের ভয়ঙ্কর হতাশা জীবনের একমাত্র জিনিস নয়। আরো আছে। অন্য-কিছুও আছে। কিন্তু তা আমাদের চোখেই পড়ে না ; আর চোখে যে পড়ে না, তাও কেউ লক্ষ্য করিনে। সহরের রাত্রির মাঝ-

খানে দাঁড়িয়ে আতঙ্কে যখন চোখ বুজি, তখন আমার কানের কাছে এ-কথা বলবার লোক আছে : 'কী করছো? চেয়ে দ্যাখো, এ-ই তো জীবন।' কিন্তু যখন আকাশের দিকে একবার চোখ তুলে তাকাইনে; লক্ষ্য করিনে ঘাসের উপর দিয়ে তীরের মত ছুটে-যাওয়া কাঠবিড়ালিকে, আর এই কাজে-নিঃশব্দ সাঁওতাল মেয়েকে, তখন কেউ আমাকে একবার বলবে না : 'দ্যাখো, চেয়ে দ্যাখো।'

আমার ভদ্রলোকের প্রবৃত্তি বলে, কপিল ভাবলে, 'মুখ ফেরাও, এই সাঁওতালনির দিক থেকে মুখ ফেরাও।' আমার সমস্ত শিক্ষা, শৈশব থেকে অর্জ্জিত যত সংস্কার, সব আমাকে অন্ধ করে' রাখবে, নিঃসাড় করে' রাখবে। আমি যদি এখনো আমার নিজের ব্যক্তিত্বের মধ্যে আবদ্ধ হ'য়ে থাকতুম, তাহ'লে কি একে কখনো চোখে পড়তো?

বাড়ির সামনে যে-ফাঁকা জমি, তারই এক কোণে কী করে' একটা বেলফুলের চারা লুকিয়ে ছিলো আগাছার জঙ্গলের মধ্যে : এক বিকেলে ঝমরকে দেখা গেলো, আগাছাগুলো হাত দিয়ে উপড়ে ফেলছে, তারপর সেই চারায় ঢালছে জল।

কপিল তার সামনে গিয়ে বললে, 'কী করছো?'

ঝমর চমকে ফিরে তাকালো। কাজের মধ্যে একটু থেমে বললে, 'ফুলের গাছ। বেলফুল।'

'গাছ কবে বড় হবে? কবে ফুটবে ফুল?'

'ফুটবে শিগগিরই। জল না-পেলে তো মরে'ই যাবে।'

বলে' সে হাতের জলের ঝারিটা গাছের গোড়ার উপ্‌ড়োনে মাটির উপর খালি করে' দিলে। আবার বললে, 'আরো কয়েকটা চারা নিয়ে আসবো, বাবু?'

'এনো, যদি তোমার খুসি হয়।'

ঝমর একটু চুপ করে' রইলো। তারপর বললে: 'এত জায়গা রয়েছে পড়ে'—একটা বাগান করো না।'

'ফুলের?'

'একধারে ফুলের—মিঠে গন্ধ ছাড়বে রাতে। আর অন্যদিকে তরকারি, আর শাক নানারকমের—সকালবেলায় আমি তুলবো, তোমার চাকর রেঁধে দেবে।'

'তরকারির একটা ভাগ তুমি নেবে না?'

'তুমি যদি দাও।'

'তোমার বাড়ির সামনে ক্ষেত আছে বুঝি?'

'সে আর কতটুকু! তোমার এত জায়গা—ফেলে' রেখেছো কেন? তুমি যদি বলো, আমি সব করে' দিই।'

'কী হবে করে'? যদ্দিনে তোমার ফুল আর তরকারি দেখা দেবে, ততদিন কি আমি থাকবো?'

'বাবু, তুমি চলে' যাবে?'

'যাবো না?'

ঝমর একটু চুপ করে' রইলো।—'কবে যাবে?'

'দেরি আছে এখনো।'

ঝমর একটু হাসলো; তার কালো রঙ চিরে ঝলসে

উঠলো তার সাদা দাঁত।—'তাহ'লে ফুলের চারা লাগানো যায়, বেশি দেরি তো ওতে হবে না।'

কপিল তার মুখের দিকে একটু তাকিয়ে থেকে বললে: 'বেশ তো, করো না।'

আর ঝমর কোথা থেকে সব ফুলের চারা নিয়ে এলো জুটিয়ে। সেই বেলের চারার কাছাকাছি সবটা জমি পরিষ্কার করে' সেগুলো সে দিলে পুঁতে। ছু'বেলা সে জল দেয়; জল দিয়ে তাকিয়ে থাকে। অন্য কাজের মধ্যে একটু ফাঁক পেলেই ছুটে এসে একবার দেখে যায়।

চারাগুলো চমৎকার বাড়তে লাগলো। আর কপিলও রোজ আসে, এসে দাঁড়ায় সেখানে; দেখে, কতটুকু বাড়লো আর। আশ্চর্য্য, এই ছোট সব টুকরো—এরই মধ্যে নিবিড় শিকড়ে এরা দাঁড়িয়ে উঠেছে, এরই মধ্যে এদের গায়ে এসেছে প্রাণের সবুজ, স্নিগ্ধ আভা। এরা বাঁচতে চায়, এদের প্রাণের উৎসাহ ফোটাতে চায় ফুলে-ফুলে। কী সহজে এরা বাঁচে—কী সহজে এরা মরে।

কপিল বলে: 'সবগুলোতে কি একই সময়ে ফুল ধরবে?'

'একই সময়ে।'

'কী হবে এত ফুল দিয়ে?'

'ফুল তোমার ভালো লাগে না?' ঝমর চোখ তুলে তাকালো।

'কিন্তু এত ফুল!'

কপিলের এ-কথাটা ঝমর ঠিক বুঝতে পারলে না। বললে, 'ফুল বড় ভালো।'

রোজ তাদের দেখা হয় একটু-আধটু। গোড়ার মাটি একটু খুঁড়ে ঝমর জল ঢালে। আর কপিলের এত ভালো লাগে মাটির সেই ভিজে গন্ধ, আর গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে ঝরে'-পড়া বিকেলের আলোর গোল-গোল সোনালি চাকৃতি, আর চারাগুলোর গায়ে প্রাণের সবুজ আভা। এই সমস্তর সঙ্গে মিশিয়ে ঝমরকে সে দেখলে। ছোট-ছোট কথা হয়। বেশি কথা ঝমর বলে না; আর কপিলের মনে যা আসে তা বলতে গেলে সে বুঝবে না। বেশির ভাগ সময়, ঝমর কাজ করে' যায়, আর কপিল চুপ করে' দেখে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে। আর সত্যি, কথা বলবার কোনো দরকার নেই।

আর তাদেরও মধ্যে যেন একটা চারাগাছ বেড়ে উঠছে; অদৃশ্য, অন্ধকার একটা গাছ, তার অন্ধকার শিকড় সত্তার গোপনতম তন্তুতে জড়ানো—তেমনি উৎসুক, প্রাণের উৎসুকতায় তেমনি কাঁপছে।

তারপর একদিন কপিল তাকে নিলে। নিলে অত্যন্ত সহজে। বিনা দ্বিধায়, বিনা লজ্জায়, বিনা অহঙ্কারে। কিছু বলা হ'লো না—বলবার কিছু ছিলো না। সেটা ঘটলো, কেউ বুঝতে পারলে না।

আর তার পর থেকে—সে যেন সব সময় রয়েছে কপিলের পিছনে, নিঃশব্দ, নিশ্চিত; সব সময় যেন তার

দিকে তাকিয়ে আছে নিঃস্পন্দ চোখে। সে যেন জলের একটা স্রোত হ'য়ে তার ভিতর দিয়ে বয়ে' গেলো, তার মধ্যে মিশে গেলো। কপিল চেয়ে দেখলো অবাক হ'য়ে।

'আমাকে তোমার সঙ্গে কলকাতায় নিয়ে যাবে?'

'কী করবে তুমি সেখানে গিয়ে?'

'আমি তোমার সব কাজ করে' দেবো।'

'সেখানে কল দিয়ে জল পড়ে, সেখানে তো তুমি ইঁদারা থেকে জল টেনে তুলতে পারবে না। আর সেখানে আমার বাড়ির সামনে এতটুকু জমি নেই যে তুমি বাগান করতে পারো।'

'আমি তোমার বাসন মাজবো। তোমার ঘর ঝাঁট দিয়ে দেবো। তোমার কাপড় কেচে দেবো।'

'না, কলকাতায় গেলে তুমি বাঁচবে না।'

'চলো না আমাকে নিয়ে।'

কপিল আবার বললে, 'না, ওখানে গেলে তুমি বাঁচবে না।'

আর এরই মধ্যে হঠাৎ একদিন, যখন চারাগুলো বেশ বড় হয়েছে, অথচ ফুল ফোটবার সময় হয়নি, বিকেলবেলায় ঝমরকে দেখা গেলো না। অথচ সকালবেলায় ঠিক সময়ে সে এসেছিলো। তার চাকর কপিলকে এসে বললে যে ঝমর রান্নাঘরের পাশের ছোট কুঠরিটায় মেঝের উপর পড়ে' ঘুমুচ্ছে।

কপিল গিয়ে দেখলো ঝমর পড়ে' রয়েছে জ্বরের ঘোরে। শরীর পুড়ে যাচ্ছে। কয়েকবার ডাকাডাকির পর সে একটু চোখ খুললো, কিন্তু তার সে-চোখ থেকে দৃষ্টি মুছে গেছে।

কপিল তাকে নিয়ে এলো তার নিজের ঘরে। বসলো তার শিয়রে। মনে-মনে ভাবলে : ওর একবার চোখ খোলা উচিত, একবার আমাকে চেনা উচিত, একবার একটা কথা বলা উচিত। কিন্তু ঝমর পড়ে' রইলো নিশ্চল, মূর্চ্ছায় আচ্ছন্ন।

ডাক্তার এসে মাথা নেড়ে চলে' গেলো। এ-রকম জ্বর এ-অঞ্চলে খুব কম হয়, কিন্তু হ'লে কোনো আশা নেই। হাতের কাছে বরফ থাকলে বরফ দেয়া যেতো মাথায়, কিন্তু তা যখন নেই, আপনি বরং একটু ঘুমিয়ে নিন্।

আর তাই কপিল জেগে বসে' রইলো সমস্ত রাত, আর সমস্ত রাত ঝমর মুখের ভিতর দিয়ে ভারি, সশব্দ নিঃশ্বাস টেনে নিলে। কখনো কপিল একটু হাওয়া করে মাথায়, কখনো একটু জল দেয় মুখে; কিন্তু মনে-মনে সে জানে যে কিছু করবার নেই। কিছু সে করতে পারে না। ও আমার চোখের উপর মরছে, আর এমন কিছু নেই, কিছু নেই, যা আমি করতে পারি।

ভোরের দিকে ঝমরের গলার ভিতর আরম্ভ হ'লো মৃত্যুর ঘর্ঘর। তার সমস্ত শরীর শেষ নিশ্চেতন যন্ত্রণায় মুচড়িয়ে, মুচড়িয়ে উঠতে লাগলো। আর হঠাৎ তার চোখ খুলে গেলো, ভীষণভাবে বিস্ফারিত হ'য়ে গেলো : তার কালো মুখের ভিতর থেকে চোখের সমস্তটা সাদা উল্‌টিয়ে বেরিয়ে এসে কপিলের চোখের উপর নিবদ্ধ হ'লো। তারপর শেষ হ'লো।

আর পরের দিন, সন্ধ্যার পর, ক্লান্ত শরীরে বিছানায় শুয়ে কপিল উপলব্ধি করলে ভালোবাসার সমস্ত অসহ্য ব্যথা।

জানলা দিয়ে তারায়-ভরে'-যাওয়া আকাশের দিকে সে তাকিয়ে রইলো। আর সমস্ত আকাশ দিয়ে, সমস্ত সত্তা দিয়ে, সহস্র মৃত্যুতে মর্ম্মরিত সমস্ত জীবন দিয়ে সে অনুভব করলে—তাকে নয়, যে এইমাত্র তাকে ছেড়ে গেলো; কিন্তু অন্য-একজনকে, যাকে সে রেখে এসেছে; যাকে, কোনো-একদিন, মিলতেই হবে তার সঙ্গে।

এইবার সময় হয়েছে, মনে-মনে সে বললে।

৬

কপিল ফিরে এলো কলকাতায়—একটু শীর্ণ, অনেকখানি কালো; কিন্তু ভিতরে-ভিতরে অনেক বেশি সুস্থ, আর তার মনের মধ্যে আশ্চর্য্য শান্তি।

প্রথমে সে গেলো বাসবের কাছে। বাইরের ঘরে মৈত্রেয়ী বসে' আছে তার এক বন্ধুকে নিয়ে। দরজার কাছে কপিল একটু ইতস্তত করলে।

মৈত্রেয়ী উঠে দাঁড়ালো, তার মুখ হাসির রেখায় মধুর। লক্ষবার এই হাসি সে হেসেছে। সে ঠিক জানে, কোন্ পেশীর উপর কতটুকু চাপ পড়লে ঠিক ফুটবে এই আপ্যায়নের হাসি।

'আসুন।'

কপিল ঘরের ভিতর এগিয়ে আসতে-আসতে বললে: 'বাসব কোথায়?'

'আছে। একটু বসুন। আমার এই বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই।'

আলাপ হ'লো। ইলা বিশ্বাসের চুল ঘন বাদামি রঙের, ডিমের ছাঁচের মুখ। কিছু বিলিতি গোছের সৌন্দর্য্য। কথা বলবার ফাঁকে-ফাঁকে একটু অদ্ভুত চোখে কপিলকে সে দেখে নিচ্ছিলো। যেমন করে' খাঁচার ফাঁক দিয়ে আমরা

চিড়িয়াখানার জানোয়ার দেখি। কপিল বসে' রইলো একটু আড়ষ্টভাবে।

'একজন লেখকের সঙ্গে আলাপ হওয়া কী ভাগ্য,' ইলা বিশ্বাস বললে।

কপিল তার পাঞ্জাবির বোতাম নিয়ে নাড়াচাড়া করলে।

'সোসাইটি নিয়ে আপনার গল্পগুলো ভালো লেগেছিলো,' সচেতনভাবে একটু হেসে ইলা বললে।

'ভালো লেগেছিলো আপনার?' এ ছাড়া কপিল কিছু বলতে পারলে না। মনে-মনে সে অবাক হ'লো। 'সোসাইটি' নিয়ে সে গল্প লিখলো কবে? ইলা বিশ্বাস, তুমি কি মনে-মনে ভাবো তুমি আমার একজন চরিত্র?

'আপনার সঙ্গে আলাপ করবার আমার ইচ্ছে ছিলো। কিন্তু আপনাকে তো কোনোখানেই দেখা যায় না।'

'ইনি কোথাও বেরোন না,' মৈত্রেয়ী বললে।

'কিন্তু সেটা কি উচিত?' ইলার মুখের ভাব প্রায় উদ্বিগ্ন হ'য়ে উঠলো। 'যাদের নিয়ে লেখেন, তাদের সঙ্গে কি আপনার মেশা উচিত নয়? না-জানলে কী লিখবেন?'

'কিন্তু জানি তো,' কপিল হঠাৎ বলে' ফেললো। 'কী না জানি?'

ইলা মৃদুস্বরে হেসে উঠলো, ঠাট্টা ভেবে।—'আপনার বেরুনো উচিত, লোকের সঙ্গে মেশা উচিত। তা আপনার লেখায় সাহায্য করবে।'

'লেখায় সাহায্য পাবো বলে'ই মিশতে বলছেন?'

'আপনার পক্ষে সেটাই তো বড় কথা। তা ছাড়া, আমার মনে হয়, লেখার বাইরে কোনো জিনিসে উৎসাহ রাখা ভালো।'

কথাটা ইনি কোথায় শুনেছেন, কপিল ভাবলে। কেননা নিশ্চয়ই এটা অন্য কোথাও শোনা, নয় তো এমন গম্ভীরমুখে, এমন নিশ্চিতভাবে ইনি বলতে পারতেন না। তা ছাড়া, কথাটার অর্থ কী? লেখার বাইরে কোনো জিনিস—? তা কি হবে 'সোসাইটি', বাদামি চুলের মেয়ে, কি ক্রিকেট খেলা—না কি, জীবনের খোলসের গায়ে যতটা নোঙ্‌রামি আটকে থাকে, তা-ই নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে হবে? তাকে কি হ'তেই হবে বিজ্ঞাপনের মত স্পষ্ট, স্থূল, প্রত্যক্ষ—যাতে সবাই দেখতে পায়, আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে পারে? কী আছে আমার লেখার বাইরে? লেখার বাইরে যদি কিছু থাকতো, তাহ'লে লেখাটাও হ'তো আমার জীবনের বাইরে। কিন্তু তা তো নয়। যা আমার লেখার বাইরে, তা আমার জীবনেরও বাইরে : তা নিয়ে আমি কী করবো?

কেননা লেখাটা যে আমার জীবনেরই একটা অংশ। লেখা ব্যাপারটার ভিতরকার প্রক্রিয়া সম্বন্ধে খুব কম লোকেরই ধারণা আছে। কোনো মেয়ের চোখের পুকুর থেকে বঁড়শি ফেলে' কবিতার লাইন তুলে আনা হয় না। চোখের সামনে যেটা ঘটে, সেটাকে তখন-তখন মনের দেরাজে তুলে রাখিনে গল্প লিখবো বলে'। বয়ে' চলে আমাদের জীবন—আর লেখা আসে। যেমন আমরা ভালোবাসি আর কাঁদি আর

একা বসে' গুন্‌গুন্‌ করে' গান করি, তেমনি আমরা লিখি। লেখাটাও তোমরা যাকে বলো 'জীবন'; লেখাটাও তোমরা যাকে বলো 'অভিজ্ঞতা'। আর সমস্ত জড়িয়ে এই যে আমাদের বাঁচা, তা-ই কি যথেষ্ট নয়, তা-ই কি সব নয়? লেখার জন্য একটা খোপ কি থাকতেই হবে, আর লেখার বাইরে যাতে উৎসাহ নিতে পারি, তার জন্য আলাদা একটা খোপ?

'কিন্তু মেলামেশারও বাড়াবাড়ি হ'তে পারে', মৈত্রেয়ী বললে। 'বাসব যদি এত সময় নষ্ট না-করতো তাহ'লে অনেক বড় লেখা সে দিতে পারতো।' বলে' সে তার সুন্দর লাল ঠোঁট গোল করে' তুলে একটু হাসলো।

যদি বাসব ইচ্ছে করতো তাহ'লে সে আমাকে নতুন একটা অলঙ্কার দিতে পারতো, যা দেখে অবাক হ'য়ে যেতো লোকে: মৈত্রেয়ীর কথাটা অনেকটা এইরকম শোনালো।

'বাসব আসলে ওর আর্টকে সে-রকম ভালোই বাসে না', ইলা বলে' উঠলো চাপা গলায়, পাখির স্বরে।

'আমারও তা-ই মনে হয়েছে', মৈত্রেয়ী বললে। 'কতদিন আমি ওকে সে-কথা বলতে গেছি।'

'ওর যদি টাকার অভাব থাকতো ভালো হ'তো। বাধ্য হ'তো লিখতে।'

'কিন্তু টাকার জন্য লিখলে লেখা খারাপ হ'য়ে যায় না?' মৈত্রেয়ী জিজ্ঞাসার দৃষ্টিতে কপিলের দিকে তাকালো।

'কী জানি!' কপিল বললে।

'আপনার তো জানা উচিত।'

কপিলের মুখ একটু লাল হ'য়ে উঠলো। কিছুদিন আগে একটা সাপ্তাহিকের প্রতি সংখ্যায় একটা ক'রে' গল্প সে লিখে যাচ্ছিলো—টাকার জন্য। লোকে তা নিয়ে কথা বলেছে। লোকে তার মধ্যে দেখতে পেয়েছে অন্যমনস্কতার চিহ্ন। তার রচনার সে-ধার সব জায়গায় থাকছে না। কথাগুলো সব সময় ঠিক জায়গায় এসে পৌঁছতে পারছে না। আমি যদি, কপিল ভাবলে, সবগুলো গল্প একসঙ্গে লিখে তারপর বছরে দুটো করে' বার করতুম, তাহ'লে ওরা কি এ-সব কথা বলতো?

'নিজের কিছু টাকা থাকলেই লেখার সব চেয়ে সুবিধে—তা-ই নয়?'

'নিশ্চয়ই, কপিল তৎক্ষণাৎ সায় দিলে।

'কিন্তু দুঃখ পাওয়া দরকার', ইলা গম্ভীরমুখে বললে। 'দুঃখ না-পেলে মানুষ বাড়ে না।'

আর-একটা, কপিল মনে-মনে বললে। এটা কেন হয় যে অন্যের কোনো কথা বললেই এরা সেটা বুঝতে দেয়? সেটা লুকোবার মত বুদ্ধি অন্তত থাকা উচিত। অন্যের কাপড় যদি পরতেই হয়, সেটা কেটে-ছেঁটে নিজের মাপসই করে' নেয়া যায় না? আর দুঃখ কি কেবল টাকার অভাব? ইলা বিশ্বাস, গরিব হবার ভয় কি তোমার এতই বেশি যে অন্য কোনোরকমের দুঃখ তুমি ভাবতে পারো না?

'বাসবকে দিয়ে কেউ যদি জোর করে' লেখায় তাহ'লে

ভালো হয়', অন্য দু'জন কিছু বলছে না দেখে ইলাকেই আবার বলতে হ'লো।

'জোর করে' কি লেখা হয়?'

'না লিখতে-লিখতে নষ্টও হ'য়ে যেতে পারে শেষ পর্য্যন্ত।'

'ওর নিজেরই এক-একটা ঝোঁক আসে মাঝে-মাঝে। দরজা বন্ধ করে' বসে' থাকে সারাদিন। কিন্তু ও-রকম করে' কিছু হয় না।'

এমনি দুই বন্ধু আলাপ করলে, 'বিশ্লেষণ' করলে, নানাদিক থেকে দেখলে। আর যখন তারা মনে করলো যথেষ্ট খাতির করা হয়েছে, সাহিত্য নিয়ে যথেষ্ট বলা হয়েছে, তারা চুপ করলো। 'আচ্ছা', বলে' কপিল উঠে দাঁড়ালো। 'বাসবকে কোথায় পাবো?'

'ওর সেই ঘরটাতেই আছে। ওর এখন লেখবার ঝোঁক।'

'আচ্ছা,' ইলা বিশ্বাস মধুর হাসিতে তার ঝক্‌ঝকে দাঁতের সারি দেখালো। দু'হাত তুলে সে নমস্কার করলে।

আর যে-মুহূর্ত্তে কপিল তাদের দিকে পিঠ ফেরালে সে অনুভব করলে যেন তাদের মুখের ভাব বদলে গেছে: দুই বন্ধু কাছাকাছি চেয়ার টেনে এনে যেন বলছে, 'এইবার।'

বাসবের বন্ধ দরজায় কপিল টোকা দিলে, কোনো উত্তর এলো না। আবার টোকা দিয়ে একটু অপেক্ষা করলে। তারপর ডাকলে, 'বাসব।'

সঙ্গে-সঙ্গে শোনা গেলো চেয়ার ঠেলে' সরাবার শব্দ।

বাসবের এক হাতে কলম ধরাই রয়েছে, অন্য হাত দিয়ে কপিলের একটা হাত সে আঁকড়ে ধরলো।

'কপিল!' তার কণ্ঠস্বরে নতুন একটা সুখের স্বর। আর কপিলের শরীর দিয়ে হঠাৎ যেন বিদ্যুৎ স্পন্দিত হ'য়ে গেলো, তার হাতের চাপে।

কপিলকে সে টেনে নিয়ে এলো ঘরের মধ্যে, তারপর —যে-চেয়ারে বসে' এতক্ষণ লিখছিলো সেখানে না-বসে' ছোট একটা চেয়ারে বসলো, কপিলের পাশে। তার মুখে তিন দিনের দাড়ি, তার চোখের নিচে কালো দাগ, গাল বসে' গেছে। শুধু তার চোখে হিংস্র, অস্থির দীপ্তি। আর সমস্ত টেবিল ভরে' কাগজের রাশি ছড়ানো, চৈত্রের গাছের নিচে যেমন অজস্র এলোমেলো পাতা। কপিল তার মুখের দিকে তাকিয়ে চুপ করে' রইলো।

'লিখছিলাম,' বাসব বললে। আর তার সমস্ত মুখে হাসি জ্বল্‌জ্বল্ করে' উঠলো আলোর মত।

'তা তো দেখতেই পাচ্ছি। আমি এসে বাধা দিলুম— কিন্তু না-এসেও পারলুম না।'

'ওঃ! এসে যায় না, কিছু এসে যায় না। অনেক সময় আছে। না—সময় নেই। সময়ই তো নেই। আর সবই আছে।'

'খুব লিখছো তো?'

'পাগলের মত লিখছি। সমস্ত মন দাউ-দাউ করে' জ্বলছে।—বেশি কাছে এসো না, পুড়ে যাবে।' বলে' বাসব

অনিশ্চিত, কাঁপা গলায় হেসে উঠলো। তাড়াতাড়ি সে কথা বলছে, একটু উচ্চস্বরে, মাঝে-মাঝে তার অগোছাল চুলের স্তূপ নিয়ে টানা-হেঁাড়া করছে। দু' মিনিট একভাবে বসে' থাকতে পারছে না।

'ততক্ষণে তোমার কি আর কিছু বাকি থাকবে! মনে হয় না,' কপিল হেসে বললে। 'যা চেহারা দেখছি।'

'ওঃ, চেহারা! স্বাস্থ্য দিয়ে কী হয়? চেহারা দেখে কী বোঝা যায়? কী ভালো আমি আছি, কী ভালো এই ক'দিন আমার লাগছে তা আমি কী করে' বোঝাবো?'

'আমি বুঝতে পারি', কপিল বললে।

'এত ভালো লাগছে যে আমি সইতে পারছিনে। আর মাঝে-মাঝে কেমন যেন ভয় করে। এ কী, আমার ভিতর থেকে যা ঠেলে উঠছে—যাকে আমি চাইনি, যাকে আমি মরে' গেলেও থামাতে পারবো না? এ যে আমার মধ্যে ছিলো তা তো আমি জানতুম না।'

কপিলের মনে পড়লো মৈত্রেয়ী আর ইলার কথা—বসে'-বসে' তারা ভাবছে কী করে' বাসবকে দিয়ে লেখানো যায়।

'কী অদ্ভুত যে আমাকে লিখতেই হবে, না-লিখে আমার উপায় নেই। না-লিখলে আমি যেন বাঁচবো না। কী-যেন মাথা খুঁড়ে মরছে, সব সময় মাথা খুঁড়ে মরছে—এইখানে', বাসব তার বুকের উপর হাত রাখলো। 'তার শক্তি প্রচণ্ড, আমাকে তা ছিঁড়ে ফেলছে। কিন্তু এমন আনন্দও আর নেই। এ-আনন্দ যে কী তা আমি কখনো বলতে পারবো না।'

বাসব উঠে গিয়ে টেবিল থেকে তার লেখার কয়েকটা কাগজ তুলে নিয়ে চোখ বুলিয়ে গেলো।—'আমার এই লেখা পড়ে' অবাক হ'য়ে যাবে।'

'ভালো হয়েছে খুব ?'

'আশ্চর্য্য ! আমারই মনে হচ্ছে যেন অন্য কারো লেখা।'

'এখন আর তাহ'লে তোমার ভাবনা নেই,' কপিল আস্তে-আস্তে বললে।

'কিন্তু কত লিখবো ?' বাসব কপিলের কথাটা যেন শুনতেই পেলে না, 'কত আর লিখবো ? মুঠো-মুঠো করে' বিলিয়ে দিতে পারি, দু'হাতে জলের মত ছড়াতে পারি। হাজার কথা এক-সঙ্গে তোলপাড় করছে মনে—কিন্তু সময় নেই। এই সমস্ত লেখা এখন যদি কোনোরকমে হারিয়ে যায় তাহ'লেও আমার ভাবনা নেই ; আমি বসে'-বসে' আবার নতুন জিনিস লিখি।'

বাসব ফিরে এসে বসলো।

'তুমি কেমন আছো ?' হঠাৎ সে জিজ্ঞেস করলে, কপিলের চোখের দিকে তাকিয়ে।

'বেশ ভালো আছি।'

একটু সময় বাসব তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো।

'কবে ফিরলে ?'

'কালই তো মোটে।'

'যার জন্যে ওখানে গিয়েছিলে তা পেলে ?'

'তার বেশি পেয়েছি।'

বলে' কপিল ছোট-ছোট কয়েকটা কথায় সাঁওতাল মেয়ের

কথা তাকে বললে।—'আমার চোখের উপর সে মরলো। আমি কিছু করতে পারলুম না।'

বাসবের চোখ আনত হ'লো।—'খুব ভয়ানক লেগেছিলো ?"

'না, সে-রকম কিছু নয়। কিন্তু নতুন একটা জিনিস পেয়েছি।'

'কী সেটা ?'

'বলতে পারবো না। শুধু মনে হয়, নিজেকে যেন হারিয়ে ফেলেছিলাম, এইবার ফিরে পেয়েছি।'

'আর তারপর ?'

'তারপর কী তা তো জানোই।'

খানিকক্ষণ দু' জনেই চুপ করে' রইলো।

'তোমার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা হয়েছিলো বাইরের ঘ'রে, কপিল বললে।

'মৈত্রেয়ী ? কী করছে সে ?'

'সঙ্গে তার আর-একজন ছিলো—ইলা বিশ্বাস। আলাপ হ'লো।'

'একটুখানি "জীবন" দেখলে, তাহ'লে ?'

কপিল একটু হেসে চুপ করে' রইলো।

'এ-ক'দিন আমার কী ভালোই লাগছে যে ঐ "জীবন" দিয়ে নিজেকে মুড়ে রাখতে হচ্ছে না। আমি পেয়েছি আমার নিজের জীবন।'

'কিন্তু এ কি সব সময় থাকবে ?'

'না-ই বা থাকলো। যে-ক'দিন পেলাম, সুখী হ'য়ে নিলাম তো।'

'সুখী হয়েছো?'

'এত সুখী হবার ক্ষমতা যে আমার আছে তা আমি জানতুম না।'

কপিল চুপ করে' রইলো। একটু পরে বাসব আবার বলতে লাগলো:

'দ্যাখো, এই পৃথিবীতে তুমি বাঁচতে পারবে না; এই পৃথিবীই তো তোমার ভিতরটাকে খেয়ে যাবে। দু' হাতে তাকে ঠেলে রাখবে, তা থেকে পালিয়ে যাবে—যেমন করে' পারো। সেটাই বাঁচবার উপায়।'

'কিন্তু তার পরেও তো কিছু আছে: নতুন একটা পৃথিবী তৈরি করা।'

'সেই কথাই তো আমি বলছি। নতুন একটা পৃথিবী: কিন্তু তা হোক্ তোমার নিজের, তোমার একলার। তুমি কি অন্যদের তার ভাগ দিতে পারবে?'

কপিল একটু ভাবলে।

'না, ভাগ দিতে যেয়ো না, অন্যদের ডেকো না সেখানে—তাহ'লেই তা নষ্ট হ'য়ে যাবে। আর যা-ই করো, আমাদের এই পৃথিবীকে নতুন করে' তোলবার কথা ভেবো না। পৃথিবীর যা হবার হোক্, তোমার তাতে কী? তুমি তোমার নিজের পৃথিবী তৈরি করবে নিজের মধ্যে। সমস্ত কথা আর সমস্ত মানুষ আর সমস্ত খবরের কাগজ একত্র হ'য়েও তাকে নষ্ট

করতে পারবে না। সেখানে তোমার অন্ধকার রাজত্ব। সেখানে তুমি মুক্ত, সেখানে তুমি চিরন্তন। সেখানে আর-কোনো প্রয়োজন তোমার নেই।'

কপিল চুপ করে' একটু ভাবলে। তারপর বললে, 'কিন্তু ভালোবাসার প্রয়োজন—যে-কথা তুমি সেদিন বলছিলে?'

বাসব মুহূর্তের জন্য হাতের মধ্যে মুখ ঢাকলো। অদ্ভুত চাপা গলায় বললে, 'যদি তা না পাও তাহ'লে আর কী করতে পারো?'

কপিল মেঝের দিকে তাকিয়ে রইলো। আর, একটু পরে, বাসবের কণ্ঠস্বর যেন আনন্দে বেজে উঠলো :

'আর যদি তা পাও—যদি তা পাও, তবে তো পেলেই। তা তো তোমার পৃথিবীকে ভেঙে দেবে না—তা তোমার মধ্যে এসে মিলবে অন্ধকার নদীর মত। কিন্তু তোমাকে সৃষ্টি করতেই হবে তোমার নিজের পৃথিবী। সবার আগে তা-ই, সবার শেষে তা-ই। তা যদি না-পারো, পৃথিবীর সমস্ত ভালোবাসা তোমায় বাঁচিয়ে রাখতে পারবে না। আর যা-ই হোক্, কি না-ই হোক্, একে হ'তেই হবে—তোমার নিজের, তোমার একলার, তোমার অন্ধকারের এই পৃথিবী।'

'হবে তা-ই', বলে' কপিল উঠে দাঁড়ালো।

৭

পরের দিন দুপুরে কপিল যখন গেলো, সমস্ত বাড়িটা চুপচাপ। পুরুষেরা গেছে যে যার কাজে, মেয়েরা ঘুমুচ্ছে।

কপিল নিঃশব্দে মিনুর ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়ালো। কিন্তু তার আগেই সে শুনতে পেলো মিনুর কণ্ঠস্বর।

লোহার সাদা খাটে মিনু শুয়ে, সাড়ির আঁচলটা মুখের উপর ছড়ানো। সে গান করছে—নরম, চাপা গলায়; অদ্ভুত, ভাঙা-ভাঙা গলায়। অদ্ভুত সে-গান—টেনে-টেনে যাওয়া, বুনে-বুনে চলা; তার কথাগুলো বোঝা যায় না, তার সুর জ্যোছনায় কুয়াশার মত। কোনো দিশি সুর, সাধারণ মানুষের, চাপা কান্নার, তাতে বিরহের আর প্রার্থনার জাদু। সেই গান মিনু গাইছিলো, নিজের মনে, আঁচলে মুখ ঢেকে, অদ্ভুত ভাঙা-ভাঙা গলায়, যেন তার গলা দিয়ে স্বর ফুটছে না। আর তবু তা উঠে আসছিলো, ক্ষীণ স্বচ্ছ স্রোতে, বার-বার; সুরের অদৃশ্য জালে একই নক্সা বার-বার বোনা হচ্ছিলো, দুপুরবেলার সেই শান্ত হাওয়ায়। কপিল অপেক্ষা করলে, তা থামলো না। তা উঠে আসছে, সেই ক্ষীণ, নরম সুরের ফোয়ারা; তা ঝরে' পড়ছে, ছড়িয়ে যাচ্ছে, দুপুরবেলাকার শান্ত হাওয়ায়।

আর কপিল স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলো, আর শুনলো ভাঙা-ভাঙা, চাপা গলার সেই অদ্ভুত গান। মিন্থুর মুখ ঢাকা, তার শরীর একটু নড়ছে না। যেন কোনো অদৃশ্য, গোপন উৎস থেকে উঠে আসছে এই গান, দিনের শরীরে লুকোনো কোনো অন্ধকার থেকে। একটু ছেদ নেই, ক্ষীণ হ'য়ে মিলিয়ে যেতে-যেতে তা আবার ঠেলে উঠছে, দিনের গোপন, অন্ধকার উৎস থেকে উৎসারিত এই গান।

আর কপিলের বুক কাঁপতে লাগলো, কাঁপতে লাগলো, যেন তা ভেঙে যাবে। ঘরে ঢুকতে তার সাহস হ'লো না, একটু শব্দ করতে তার সাহস হ'লো না। তার সামনে এক অন্ধকার, অনির্ব্বচনীয় রহস্য : তার ভিতরে তাকে ঢুকতে হবে, ঢুকতেই হবে। কিন্তু তার সাহস হয় না ; বাইরে দাঁড়িয়ে সে কাঁপছে।

বারান্দা দিয়ে কে যেন চলে' গেলো। আর, পাছে কেউ তার কাছে এসে পড়ে, এসে তার সঙ্গে কথা বলে, কপিল তাড়াতাড়ি ঢুকে পড়লো ঘরের মধ্যে। কিন্তু তবু থামলো না গান। সে আরো একটু অপেক্ষা করলে, তারপর গিয়ে দাঁড়ালো মিন্থুর শিয়রে। পাশের ছোট টেবিল থেকে একটা বই তুলে নিয়ে ফেলে দিলে মেঝের উপর।

মিন্থু মুখ থেকে আঁচল সরিয়ে তাকালো। কিছু দেখতে পেলে না। আর তারপর সে মুখ ফেরালো শিয়রের দিকে। সে উঠলো না, কিছু বললে না ; খানিকক্ষণ শুধু চুপ করে' তাকিয়ে রইলো কপিলের মুখের দিকে।

তারপর বললে, 'এসো'। বলে' উঠে বসলো। কোনো-রকম করে' জড়ানো খোঁপা ভেঙে তার দীর্ঘ কালো চুল নেমে এলো বৃষ্টির পশলার মত।

'তোমার গান থামিয়ে দিলুম।'

'গান শুনতে চাও?'

'না, এখন আর নয়।'

কপিল বসলো খাটের অন্য ধারে। মিনুর মুখ একটু ফেরানো, তার চোখ আনত। থেকে-থেকে তার চুলের গন্ধ কপিলের বুকে এসে লাগছে।

খানিক পরে মিনু চোখ তুলে তাকালো।—'বাইরে গিয়ে কেমন ছিলে?'

'ভালো ছিলাম বেশ।'

'এখন তোমার মন শান্ত হয়েছে?'

'হ্যাঁ, শান্তি আমি পেয়েছি। সে আশ্চর্য্য।'

মিনু তার স্তব্ধ কালো চোখ কপিলের কৃশ মুখের দিকে তুলে চুপ করে' রইলো।

'এখনো কি সময় হয়নি?' একটু পরে কপিল বললে।

'কে জানে!'

'তুমিই তো জানো।'

'আর তুমি—তুমি ঠিক জানো? ভালো করে' ভেবে তারপর বলো।'

'ভাববার কিছু নেই।'

‘আমি অনেক ভেবেছি,’ মিনু আস্তে-আস্তে বললে। ‘কিন্তু যা আমরা ভাবি, তা-ই কি হয় ?’

‘না, তা হয় না। কিন্তু যা আমরা চাই, তা-ই হয়।’

‘কী নিশ্চয়তা আছে তার ?’

‘না, নিশ্চয়তা কিছু নেই। থাকবেই বা কেন ? নিশ্চয়তা আছে যন্ত্রে, জীবনে তা থাকে কী করে’ ?’

‘তাহ’লে দেখা যাক্ জীবন আমাদের কোথায় নিয়ে যায়।’

‘এখনো কেন সংশয় তোমার মনে ?’

‘যদি কোনো সংশয় থাকে তা তোমারই জন্যে।’

‘আমি জানি তোমার মনের কথা। কোনো নিশ্চয়তা যে নেই—বড় লাগে এ-কথা মনে করতে। যা চাই তাকে কি পাবো ? ও-কথা জড়িয়ে কত দ্বিধা, কত যন্ত্রণা, কত কান্না। তা তো ছাঁচে-ঢালা, তৈরি জিনিস নয় যে হাত বাড়ালেই পাওয়া যাবে। চাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই তো পূর্ণতা আসে না। আর, যা-ই বলো না, তা আসে না বলে’ই তো এত মজা।’

‘এ-সব কেন বলছো ?’

‘কিন্তু দুঃখও আছে বইকি’, কপিল বলতে লাগলো, যেন নিজেরই মনে, ‘বড় ভীষণ দুঃখ সেই চাওয়ার। কান্নায় তোমার বুক ভেঙে যাবে, হতাশায়। তবু তা সইতে হবে। তবু যেন আমরা ভুল না করি। নিজের উপর অভিমান করে’ ভুল না করি।’

‘ভুল আমি করবো না’, মিনু বললে, ‘ভুল আমি কখনো করি না।’

একটু সময় কপিল চুপ করে' রইলো, চুলের মধ্যে আঙুলগুলো চালানো।

'ও-কথা তুমি বলতে পারো ?'

'না, ভুল আমি করিনে,' মিনু আবার বললে।

'আমি ও-কথা বলতে পারিনে। আমি ভুল করেছি অনেকবার। কিন্তু সব সময় মনে-মনে আমি জানতুম যে ভুল করছি।'

'তুমি কি এখন দুঃখিত তার জন্য ?'

'এমন অপব্যয়—নিজের এমন অপব্যয়। কিন্তু ও-রকমই হয়, ও-রকম হ'তেই হয়। হয়-তো তারও প্রয়োজন আছে। দুঃখিত কেন হ'বো ? এমনি করে'ই তো আমরা পূর্ণ হ'য়ে উঠি। নিজেকে ছড়িয়ে দিয়ে, নিজেকে হারিয়ে ফেলে', নিজেকে পায়ের নিচে মাড়িয়ে গিয়ে। সেই কষ্ট যদি না-জানতুম তবে কি আজ এই আশ্চর্য্য শান্তি আমি পেতুম ?'

মিনু কিছু বললে না। তার মুখ ফেরানো, তার চুলের গন্ধ কপিলের বুকে এসে লাগছে।

'সেই সমস্ত পার হ'য়ে আমি আজ তোমার কাছে এসেছি', কপিল বললে।

তবু মিনু কিছু বললে না। কপিল তার একটু কাছে সরে' এলো, তারপর বলতে লাগলো :

'প্রথম যখন তোমার কাছে এসেছিলুম, আমাকে ফিরিয়ে দিয়ে ভালো করেছিলে। আমি এসেছিলুম আমার হতাশা থেকে ; তোমার কাছে চেয়েছিলুম সান্ত্বনা, চেয়েছিলুম শান্তি।

কিন্তু ও-রকম করে' হয় না। আমার মধ্যে ছিলো অভাব, ভেবেছিলাম, তোমাকে দিয়ে তা ভরে' তুলবো।'

'তা কি ভরতো?' ক্ষীণ, ক্ষীণস্বরে মিনু বললে।

কপিলের মুখে ছোট একটু হাসি খেলে গেলো :

'কিন্তু এখন আমি পেয়েছি আমার নিজের শান্তি। এখন আমি তোমাকে ডাকছি, হতাশা থেকে নয়, নিঃসঙ্গতা থেকে নয়—আমার আনন্দ থেকে, পূর্ণতা থেকে। সমস্ত ভাঙাচোরা, সমস্ত ক্ষত আর লজ্জা পার হ'য়ে এসে—আমি, নতুন, সদ্যোজাত, সম্পূর্ণ, আমি তোমাকে ডাকছি। এখন আর তুমি আমাকে ফিরিয়ে দিয়ো না।'

আর আস্তে, আস্তে, পাখির মত, নরম পাখির মত, মিনুর ছোট, নরম হাত কপিলের হাতের উপর এসে পড়লো, ছোট, ছোট আর নরম, আগুনের শিখার মত নরম, আর শিখার মত উষ্ণ, রক্তের আগুনে উষ্ণ; আর কপিলের হাতের ভিতর দিয়ে যেন এক অপরূপ সুরা রক্তের মধ্যে গিয়ে মিশলো; আর তার সমস্ত মাংস যেন জ্বলে' উঠলো, জ্বলে' উঠলো আনন্দে।

আর তারপর তার মনে হ'লো এ আর সে সইতে পারছে না : মনে হ'লো, মিনুর ছোট, নরম হাতের চাপে সে যেন মরে' যাবে—সে যেন ছিঁড়ে যাবে এই আনন্দে, এই ব্যথায়। হাত ছেড়ে দিয়ে সে উঠে দাঁড়ালো।

'আবার কবে আসবে?' মিনু জিজ্ঞেস করলে।

'যে-কোনোদিন।'

'কাল আসবে ?'

'আসতে পারি।'

'না, বলে' যাও আসবে কিনা।'

'আসবো।'

আর পরের সন্ধ্যায় কপিল তাকে পেলো ছাতে, পাটি পেতে বসে'। একটু আগে সে স্নান করেছে; পিঠের উপর এলানো তার চুল এখনো জলে চিকচিক করছে।

অনেকক্ষণ কেউ কিছু বললে না।

তারপর কপিল মিনুর আঙুলের মধ্যে নিজের আঙুল জড়িয়ে বললে :

'তোমার জন্য একটা আংটি আনতে ভুলে' গেলুম।'

'কী হবে আংটি দিয়ে ? এ-ই তো যথেষ্ট।

'তবু আমরা চাই বাইরে প্রকাশ করতে। সেটা পুরুষের দুর্ব্বলতা।'

'দিয়ো আংটি এনে।'

আবার খানিকক্ষণ চুপচাপ।

'সবাই এখন জানবে', কপিল বললে।

'জানবেই তো।'

'সে-কথা ভাবতেই আমার খারাপ লাগছে।'

'কেন ?'

'লোকের কথাকে আমি বড় ভয় করি। তাদের ব্যাখ্যা। তাদের বিশ্লেষণ।'

'তুমি তো আর সে-সব কথা শুনবে না।'

'কিন্তু তবু—কেউ যদি কখনো না জানতো! যদি এমনি হ'তো চিরকাল! যে-মুহূর্ত্তে আমরা হ'বো স্বামী আর-স্ত্রী, তখনই আমরা এই সমাজের একটা অংশ হ'য়ে গেলাম, তখনই এই পৃথিবী তার কুৎসিত, স্যাঁৎসেঁতে হাত বাড়াবে আমাদের ধরতে। তাকে এড়াতে চাই, ভুলতে চাই তাকে; কিন্তু তাকে একেবারে বাদ দিয়ে তোমাকেও আমি নিতে পারিনে।'

'কিন্তু তা ছাড়া উপায় কী?'

'না, উপায় নেই। যেমন আমাকে সইতে হয় টাকা রোজগারের নোংরামি, তেমনি এ-ও সইতে হবে।'

'কিন্তু কী এসে যায় তাতে? এ কতটুকু—তোমার এই সমাজ আর পৃথিবী? এ তো নেহাৎই বাইরের জিনিস। তুমি আর আমি তো আছি—যা ছিলাম, তা-ই আছি।'

'আর তা-ই থাকবো', কপিল বললে।

'হ্যাঁ, তা-ই থাকবো।'

একটু চুপচাপ।

'কী শান্তি, কী আশ্চর্য্য শান্তি তোমার মুখে এ-কথা শোনা,' বলতে-বলতে কপিল মিনুর সমস্ত চুল দু' হাতে তুলে ধরলো, তারপর সেই ঠাণ্ডা, নরম চুলের রাশিতে চেপে ধরলো তার মুখ। ঐ চুল দিয়ে নিজেকে সে যেন জড়িয়ে রাখতে চায়, ঢেকে রাখতে চায়। লুকিয়ে থাকতে চায় এই অন্ধকারে—মানুষের সমাজ থেকে অনেক দূরে, এই

কুৎসিত পৃথিবী থেকে অনেক, অনেক দূরে। ঠাণ্ডা, অন্ধকার এই ঝরনা তার মুখের উপর ঝরে' পড়ছে, তার বুকের উপর—ঝরে' পড়ছে তার গভীরতম আত্মায়।

এমনি কাটলো খানিকক্ষণ। তারপর মিনু আস্তে-আস্তে মুখ ফেরালো পিছনে, যেখানে কপিলের মুখ তার চুলের মধ্যে মগ্ন। রুদ্ধস্বরে ডাকলে, 'এই, শোনো।'

কপিল মুখ তুলে তাকালো, সন্ধ্যার ছাদের অস্পষ্ট আলোয় অদ্ভুত, পাংশু তার মুখ। আর হঠাৎ মিনুর ক্ষীণ দুই বাহু কপিলকে ঘিরে জড়িয়ে ধরলো, তার সমস্ত শরীর ঢেউয়ের মত ভেঙে পড়লো তার উপর; আর সেই তার স্তব্ধ, শুভ্র মুখ হঠাৎ কপিলের চোখে আগুনের একটা ঝড় হ'য়ে উঠলো, আগুনের উদ্দাম ঝড়, হাজার উদ্দাম অগ্নিশিখা অন্ধকারের ভিতর দিয়ে ফেটে পড়ছে। কপিল হাত বাড়িয়ে তাকে নিতে যাচ্ছিলো, কিন্তু পরের মুহূর্তে মিনু নিজেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেলো, আর তার দুই চোখ ভরে' উঠলো জলে। নিজেকে সে সামলাতে চাইলো, চাইলো কপিলের দিকে তাকাতে, কিন্তু সেই চেষ্টায় সে আরো ভেঙে পড়লো, কান্না উথলে উঠলো তার বুক ঠেলে'। দূরে সরে' গিয়ে দু' হাতের মধ্যে সে মুখ ঢাকলো, আর কপিল বসে' রইলো স্তব্ধ হ'য়ে।

৮

'তুমি চলে' গেলে, রাত বাড়লো বাড়ির সবাই একে-একে ঘুমিয়ে পড়লো, আমি জেগে রইলুম। সবাই ঘুমিয়ে আছে, আমি জেগে বসে' তোমায় চিঠি লিখছি।

এর আগে কখনো তোমায় চিঠি লিখিনি—ভারি অদ্ভুত লাগছে। এইমাত্র তুমি গেলে, দু'দিন পরেই আবার দেখা হবে, তবু লিখছি। না-লিখে পারছিনে।

যখন সিঁড়িতে তোমার পায়ের শব্দ শুনি, যখন দেখি তোমার মুখ, যখন শুনি তোমাকে কথা বলতে—কেউ জানে না কী কষ্ট আমি পাই, আমি যে ভেঙে লুটিয়ে পড়তে চাই, মরে' যেতে চাই। কেউ জানে না, শুধু আমি জানি। অনেক লোকের মধ্যে তোমাকে যখন দেখবো, কেমন করে' আমি তাকাবো তোমার দিকে? কথা বলবো কেমন করে'?

এখন তুমি কাছে নেই, তবু সেই কষ্টে আমি কাঁপছি। টিপ্‌টিপ্‌ করছে আমার বুক, আমার কেমন ভয় করছে।

তুমি কি অবাক হয়েছিলে, আমি যে কেঁদেছিলাম? কিন্তু আর কী উপায় ছিলো, আর কী উপায় ছিলো আমার? আজ সকাল থেকে আমার চোখ থেকে-থেকে

কেবলই জলে ভরে' উঠছিলো। কেননা আজ তুমি আমার কাছে আসবে।

আর এখন—এখনও যদি আমি চুপ করে' থাকি, কান্নায় আমি অন্ধ হ'য়ে যাবো।

কী সুন্দর তুমি—আর কী ভয়ঙ্কর। তোমার মুখের দিকে আমি তাকাতে পারিনে। তোমাকে আমি কেমন করে' সইবো?

তবু আমি জানতুম একদিন আমাকে এমনি করে' কাঁদতে হবে। অনেকদিন থেকেই তা ঘনিয়ে আসছে বুকের মধ্যে। আর এতদিন তা প্রতীক্ষা করেছে—তোমার। একদিন তুমি আমাকে স্পর্শ করবে—আর তখন তা বুক ঠেলে' উঠে আসবে—কোনো বাধা মানবে না। আমি তা জানতুম।

তুমি কি রাগ করেছিলে, আমি যে সরে' গিয়েছিলাম, কেঁদেছিলাম? কিন্তু এ-কান্না তো দুঃখের নয়: এ আনন্দের, এ সার্থকতার। যা চেয়েছিলাম—অনেক, অনেকদিন ধরে' যা চাইছি তা পেলাম, তাকে যে পাওয়া গেলো, এই অসহ্য উপলব্ধির আনন্দ। কী আনন্দ তা আমি বলতে পারবো না।

আমি তোমাকে চলে' যেতে বলেছিলাম—চলে' তুমি গিয়েছিলে। আর আমার দিন আর রাত যেন বদলে গেলো: পেখম-তোলা ময়ূরের মত দিন, প্রতি মুহূর্তে রঙ বদলাচ্ছে; আর রাত্রির অন্ধকার যেন আমার বুকের মধ্যে কথা কয়ে'

উঠতে চায়। রাত বাড়ে, আমার ঘুম আসে না ; হাতের উপর মাথা রেখে শুয়ে চুপ করে' ভাবি। কী ভাবি জানিনে।

এর আগে আমি কখনো জানিনি, রাত্রির মধ্যে যে-সব স্বর লুকিয়ে থাকে। অশরীরী ছায়া-স্বর : যে-মুহূর্তে আলো নিবিয়ে দিয়ে শুতে যাই, তারা যেন লাফিয়ে ওঠে, ছুটে মারতে আসে আমাকে। আমার স্বপ্নকেও যদি তারা হানা দেয়, সেই ভয়ে আমি চোখ বুজতে পারিনে।

আর তবু --এখন তুমি এসেছো, এখন আমার প্রায় বলে' উঠতে ইচ্ছে করছে : আমাকে ছেড়ে দাও, মুক্তি দাও আমাকে। যখনই তুমি আমার দিকে তাকাও, হঠাৎ একটা আগুন লাফিয়ে ওঠে, জড়িয়ে ধরে আমাকে। এ আমি কেমন করে' সইবো ?

মনে-মনে প্রায় বলে' ফেলি—তোমার সঙ্গে দেখা না-হ'লেই ভালো ছিলো। আমাকে কি চিরকাল জ্বলতে হবে, তোমার দৃষ্টির অন্ধকারে, অন্ধকারের মধ্যে লুকোনো, গোপন আগুন ?

তবু আমি জানি যে আমি আর ছাড়া পারবো না। তুমি এসেছো তোমার পূর্ণতা থেকে আমার কাছে। আমি মিলেছি আমার সার্থকতা থেকে তোমার মধ্যে। এখন আর কিছু বলবার নেই।

কিছু আর বলবার নেই এখন। এখন আর সময় নেই ভাবনার কি স্বপ্নের। তোমাকে বলি, তোমার স্বপ্ন দিয়ে আমাকে জড়িয়ে রেখো না। দেবতার মত হও তুমি, দেবতার মত স্নেহ কোরো আমাকে। আমার সমস্ত ত্রুটি আর

অসম্পূর্ণতার উপর পড়ুক তোমার দৃষ্টি। আমার রচনায় সেই-সব ফাঁক তুমি ভ'রে' তুলো—স্বপ্ন দিয়ে নয়, কল্পনা দিয়ে নয়, স্নেহ দিয়ে, করুণা দিয়ে।

আরো বলি তোমাকে : তোমার অনাদর, তোমার মলিনতা, তোমার উদাসীনতা থেকে দূরে সরিয়ে রেখে আমাকে লজ্জা দিয়ো না। অন্য সব জিনিস থেকে আলাদা করে' রেখো না আমাকে। শুধু কি তোমার আনন্দ, তোমার সৌন্দর্য্য, তোমার চুম্বনই নেবো; আর যেখানে তুমি ক্লান্ত, প্রতিদিনের আঘাতে দীর্ণ, যেখানে তোমার গায়ে লেগেছে এই পৃথিবীর আঙুলের দাগ, সেখানেই থাকবো অন্ধ হ'য়ে? তোমার ভালোবাসা সইতে পারবো, আর তোমার বিমুখতা সইতে পারবো না?

আমি তোমার কাছে চুপ করে' বসে' থাকবো; তোমার সেবা করবো, তোমার শরীরের সেবা করবো। আমি তোমার কাছে চুপ করে' বসে' থাকবো।

হয়-তো এ-রকম চিরকাল থাকবে না। কেনই বা থাকবে? নতুন জিনিস আসবে : নতুন আশা, নতুন আনন্দ, নতুন দুঃখ। আর সবার শেষে থাকবো তুমি আর আমি, সবার আগে যেমন ছিলাম। এখন যেমন আছি।

যেমন আছি আজকের এই রাত্রিতে। কী চুপচাপ চারদিক —কলকাতা এমন চুপচাপ হ'তে পারে কখনো জানতুম না। কোথায় একটা কোকিল ডেকে উঠছে থেকে-থেকে, লিখতে-লিখতে আমি অন্যমনস্ক হ'য়ে যাচ্ছি। তুমি কী করছো?

আজকের সমস্ত দিনটার কথা যত ভাবছি, ততই অবাক লাগছে। রাত্রে যখন খেতে গেলুম, আমার মুখ তুলতে সাহস হয় না। আর খাওয়ার পরেই পালিয়ে চলে' এলুম—এখানে, আমার এই ঘরে : সেই কখন্ থেকে বসে' আছি জানলার ধারে। আজ আমি আর-কিছু চাইনে, শুধু একা থাকতে চাই : তোমার সঙ্গে থাকতে চাই, একা। কী ব্যাকুলতা, তোমার কাছে যাবার জন্য আমার রক্তের কী ব্যাকুলতা।

মাঝখানে দু'দিন তোমাকে দেখবো না। কী তোমার এমন কাজ একটু আসতে পারবে না? এক সময় আমি ভাবতুম, অনেক সময় আছে, অনেক সময় আছে এখনো। ভাবতুম, শান্ত হ'য়ে অপেক্ষা করবার শক্তি আমার আছে। কিন্তু আজ আর একটা মুহূর্ত্তও আমার হারাতে ইচ্ছে করছে না। সমস্ত জীবনও যে যথেষ্ট নয়; আমাদের জীবন আর কতটুকু?

তবু আজ মনে হচ্ছে যেন আমাদের জীবন চিরকালের; তোমার জীবন, আর আমার : আর এই রাত্রির ভিতর থেকে আমার হৃদয় তোমাকে ডাকছে, তোমাকে ডাকছে, বাইরে যেমন থেকে-থেকে কোকিল ডেকে উঠছে।

তাহ'লে শেষ করি চিঠি, শুতে যাই। আমার এই চিঠি ভরে' আমার হাতের স্পর্শ তোমাকে পাঠালুম, সমস্ত কথার চেয়ে তা বেশি। এখন শুতে যাই, যদিও জানি শুয়ে-শুয়ে অনেকক্ষণ ঘুমোতে পারবো না।'

'আজ সারাটা দিন বাইরে-বাইরে ঘুরতে হ'লো, টাকার

দরকার। তোমাকে যে বিয়ে করতে যাচ্ছি, তার জন্যেও টাকার দরকার। পৃথিবীর প্রতিশোধ।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত জিৎ আমারই। বাঁচবার জন্য যেটুকু টাকার আমার দরকার, তা কোনোরকম করে' নিঙড়ে বার করে' আনবো, তারপর দেবো দরজা বন্ধ করে' পৃথিবীর মুখের উপর।

যেমন এখন দিয়েছি। এখন রাত্রি, আর আমি একা। এখন আমি একা, আমি সুখী।

সমস্ত দিন কাটলো নানা লোকের সঙ্গে নানারকমের কথায়---সে-সব মনে করলেও এখন মরে' যেতে ইচ্ছে করে। কিন্তু এমন বোকা কে যে মনে করবে? শেষ হ'লো দিন, দিনের গ্লানিও শেষ হোক্ সেই সঙ্গে। এখন, এই রাত্রিতে আর এই নীরবতায় আমি তোমার।

শোনো, কিছু টাকা পাওয়া যাবে—চলো কোথাও যাই, সমুদ্রের ধারে কোথাও। তোমার মুখ অমন ম্লান কেন—আর এত কম তুমি হাসো! আমার ইচ্ছে করে তোমার হাসি শুনতে—রূপোর ঘণ্টার মত আকাশে বেজে উঠছে। সমুদ্রের ঢেউ যখন তোমাকে পিছন থেকে ধাক্কা দিয়ে আছড়ে ফেলবে, তখন অমনি করে' তোমাকে হাসতে হবে। না-হেসে তুমি পারবে না। চলো যাই। সমুদ্র তোমাকে নতুন প্রাণ দেবে, আমি তোমাকে নতুন প্রাণ দেবো।

আর সেই যাওয়া যাতে সম্ভব হ'তে পারে, তার জন্য আমাকে এখন লিখতে বসতে হবে। টাকার জন্য নাকি